KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : —
Collection : KLMLGK	Publisher : —
Title : [illegible]	Size : 7"x9" 17·78x22·86 c.m.
Vol. & Number : ৩/১০	Year of Publication : শ্রাবণ, ১৩৫১
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : এম. ওবায়েদ আলি	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

গুলিস্তাঁ

ঃ প্রগতিশীল সচিত্র মাসিক মুখপত্র ঃ

বাংলার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী খানবাহাদুর হাশেমআলি খান কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত
মিঃ এস্ ওয়াজেদ আলি বি-এ, (কেণ্টাব) বার-এট্-ল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

৩য় বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৫১ | ১০ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

আরম্ভেই বিঘ্ন

নবকলেবরে দেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিক-বৃন্দের মৌলিক রচনা লইয়া গুলিস্তাঁ আবার প্রকাশ করিব, এই আশা বহু দিন হইতে আমাদের ছিল। ইহা বিভিন্ন বিভাগে সুদৃশ্য হইয়া যাহাতে সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ হইতে পারে, সেজন্য আমাদের প্রস্তুতি এবং উদ্যোগ-আয়োজনও ঠিক ছিল। কিন্তু, ইহার মধ্যেই আমাদের মোহনীয় স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার-শৌর্য্য তার অপরূপ রূপ প্রকাশ করিয়া বসিয়াছে। যুদ্ধের বহুমুখী বাধা-বিপর্য্যয় অতিক্রম করিতে-করিতে আমরা ত পর্য্যুদস্ত হইবার মত—তাহার উপর আছে ভারতরক্ষা আইন আর নিত্য নুতন-নুতন অর্ডিনান্স। গুলিস্তাঁ শুরুতেই এই মহাঅস্ত্র অর্ডিনান্সের কবলে পড়িয়াছে। এক্ষণে পত্রিকার পৃষ্ঠা-সংখ্যা শতকরা সত্তর ভাগ কমিয়া যাইবে। একশো পাতা হইতে সত্তর পাতা উবিয়া গেলে পত্রিকা প্রকাশের সার্থকতা কি, আমরা বুঝি না। তবু হোঁচট খাইতেও আমরা রাজী নই। আশা করি, আমাদের শুভানুধ্যায়ীরাও আমাদের সঙ্গে পা চালাইতে অনিচ্ছুক হইবেন না। সময় আসিলে তৎপর হওয়া যাইবে। যাহা হাতে রহিয়াছে, তাহার ব্যবহার যাহাতে সুন্দর, রসসম্মত হয়—সে-দিকে আমরা অতঃপর দৃষ্টি রাখিব, মনস্থ করিয়াছি।

দেশের কথা

বাঙলা দেশের কথা। ১৩৫০-এর মন্বন্তর দেশের উপর দিয়া সোর-সরাবতের সংগে নাচিয়া গিয়াছে। দেশের এক প্রান্ত হইতে আর প্রান্ত পর্যন্ত এই নৃত্য সমান তালে চলিয়াছিল। আজও মন্বন্তরের সেই ভয়াবহ আবহাওয়া নিশ্চিহ্ন হয় নাই; নানা আশংকায় বিশেষজ্ঞদের চিন্তা ভিন্ন-ভিন্ন পথে আনাগোনা করিতেছে। গবর্ণরের

সান্ত্বনাবাণীতে স্বস্তি পাইবার পরিবর্ত্তে বিভাগীয় মন্ত্রীর অশোভন অনাত্মীয় বক্রোক্তিতে পূর্ব্বাপর সকল সান্ত্বনা-স্বস্তির অবলুপ্তি নিষ্ঠুর হাসির সৃষ্টি করিতেছে মাত্র। দেশের মানুষ এতো বেশি ঠকিয়াছে যে, উর্দ্ধে চক্ষু মেলিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ ভিন্ন কোনরূপ বিরূপ সমালোচনা আজ আর আসর জমাইতে পারিতেছে না। নদীমাতৃক দেশে মন্বন্তর! অপূর্ব্ব প্রদর্শনী! সতত অভাবগ্রস্থ জীবন কোন-না-কোন উপায়ে ডেরা বাঁধিয়া মাথা তুলিয়াছিল; তাহার শেষ চিহ্নেরও আজ কোন সন্ধান নাই। কেন এই মন্বন্তর হইয়াছিল? আজো যুক্তিযুক্ত কোনো বিস্তারিত আলোচনা সম্পূর্ণ বাহির হয় নাই। দেশের মাটি হইতে কত মানুষ আমরা হারাইয়াছি?

কোন উত্তর মনকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নহি!

আর কাহাকে বিশ্বাস করিব?

আমেরিকে?—ভারত গবর্ণমেণ্টকে?—বাঙলা গবর্ণমেণ্টকে? প্রচারিত পুস্তক-পুস্তিকা? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগীয় অধ্যাপকের করচা? সন্ধানী-কমিশন বসিয়াছে, তাহাতে আস্থা রাখা যুক্তিযুক্ত হইবে?

গবর্ণর বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের নূতন আবির্ভাবের আশংকা নাই। দেশে চাউল প্রচুর মজুত রহিয়াছে। বিভাগীয়-মন্ত্রী বলিয়াছেন, অত-শত খবর রাখি না। সহযোগিতা না করিলে বাঙলা তাহার নাক অবশ্য হারাইবে!

আমরা স্বায়ত্তশাসন পাইয়াছি। দেশের মন্ত্রী-সভা আমরাই তৈয়ারী করিয়াছি। দেশের প্রতিভূ তাঁহারা। দেশের নাড়ীকে চিনিতে আজ মন্ত্রী-সভা যে অযৌক্তিক নির্লজ্জ ব্যবহার প্রদর্শন করিতেছেন—ইহার কোনো সদুত্তর আছে?

আমরা বিশ্বাস করিব। কিন্তু কি করিয়া তাহা সম্ভব হইবে? দেশের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে যাঁহারা সচেতন নয়—কুৎসিৎ অব্যবস্থাকে যাঁহারা কবলিত করিয়া সুষ্ঠু সুন্দর পরিকল্পনায় দেশের আস্থাভাজন হইতে পারিল না,—তাঁহাদের কে বিশ্বাস করিবে?

সংক্রামক-ব্যাধি

দুর্ভিক্ষের পরে-পরেই আসিয়াছে সংক্রামক-ব্যাধি। আসিয়াছে টাইফয়েড, বসন্ত, কলেরা ও ম্যালেরিয়া। বাঙলার সর্ব্বত্র সংক্রামকভাবে এই ব্যাধির প্রকোপ নাচিয়া ফিরিয়াছে। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও মেদিনীপুরে অন্ততঃ ৫০ ভাগেরও উপর লোক নানাবিধ রোগের প্রকোপে নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে। ডাঃ বিধান রায় বলিয়াছেন: 'বসন্তের আক্রমণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। কলেরার প্রকোপ মধ্যে একটু ভাঁটা পড়িয়াছিল, কিন্তু আবার তাহা রুদ্র আকার ধারণ করিয়াছে।' এবং ব্যাধির উপশমের কোন লক্ষণ কোথাও নাই। বিভিন্ন স্থানে যাঁহারা সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের হিসাবে প্রকাশ, আজো বাঙলার দুই কোটীর অধিক লোক ব্যাধিগ্রস্থ। আর 'বাংলার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দূরীকরণের চেষ্টা পর্য্যাপ্ত নহে'! সহযোগিতার বাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছে, মন্ত্রী-সভার নিষ্ঠুর নির্ব্বিকারচিত্ততা বাঙলার কোটী-কোটী মেরুদণ্ড মুচড়াইয়া দলিয়া দিয়াছে। নূতন সৌহার্দ্দের আবির্ভাব আর সম্ভব নয়। তবু, চেষ্টা চরিত্র চলিতেছে। আমরা লক্ষ্য রাখিব। দেখিব, নূতন চূণ-সুড়কি, আস্তরণ কোন্ সুরম্য সৌধ নির্ম্মাণ করিতে পারে!

দামী, ভাল অষুধের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, প্রচুর কুইনিনও আজ আমাদের ঘরে নাই। ডাঃ বিধান রায় বলিয়াছেন, বছরে বাঙলার আজ

২৩০,০০০ পাউণ্ড কুইনিন লাগিবে। গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়া বিভিন্ন অঞ্চলে বরাদ্দ করিয়াছেন ১,২৪,০০০ পাউণ্ড। বাঙলার তিনটি হতভাগ্য মানুষ কি গড়ে আজ একটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

তার উপর আরো ফ্যাসাদ রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট জেলা কর্ত্তৃপক্ষের হাতে কুইনিন জমা রাখেন। দিশী সেবাদল (বেসরকার সেবা-সমিতি)গুলি সব সময় প্রয়োজন মাফিক কুইনিন সংগ্রহ করিতে পারে না। কারণ, জেলা-কর্ত্তৃপক্ষের বিতরণ-চাতুর্য্যের আলোড়ন সহজ সামগ্রী নয়। অথচ, দেশের সেবা-নিয়ন্ত্রণ সমিতির প্রচেষ্টায় গত তিন মাসের মধ্যে প্রায় দশ লক্ষেরও বেশি পীড়িত-দুঃস্থের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙলা গবর্ণমেণ্ট কি অবশিষ্ট হতভাগ্য বাঙালীর সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে পারেন না?

পারিবেন, সে-আশা নাই। তবু ধরিয়া লইলেও আমরা সরকারকে বিশ্বাস করিতে পারিব কি? বাঙলার কোটী অর্দ্ধভুক্ত দুঃস্থ, ক্লিষ্ট, পীড়িত হতভাগা সন্তানদের আমরা কোন্ ভরসায় তাঁহাদের হাতে ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত থাকিব?

ব্যাধি ও চিকিৎসা

বসন্ত আজকের সংক্রামক ব্যাধির অন্যতম এবং বসন্তই আজ বেশীমাত্রায় সক্রিয়, দুর্জাত। বাঙলা গবর্ণমেণ্ট বসন্ত প্রতিরোধের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? পাইকারী হারে গাঁয়ে-গাঁয়ে গবর্ণমেণ্ট বসন্ত প্রতিরোধক টীকা দেওয়াইতেছেন, সামরিক কর্ত্তৃপক্ষও সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু দেশের বিশ্বাসভাজন দরদী-বিশেষজ্ঞ বলিতেছেন: 'বসন্তের টীকা সম্বন্ধেও দেখা যাইতেছে লীম্ফগুলি এতই নিম্নস্তরের সরবরাহ করা হইতেছে যে, তাহার ফলে বসন্ত বাধা মানিতেছে না।'

আমাদের বিস্মিত হইবার পালা, আমরা অবশ্যই বিস্মিত হইতেছি। জীবনকে আমরা তুড়ি দিয়া হাওয়া করিয়া দিয়াছি। আমরা করি নাই কি? নিজের ঘরে পর্য্যাপ্ত খাবার সংস্থান রাখিয়াছি, আর মৃদু হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত রাখিয়া পড়সীর মৃত্যু-কাতর সন্তান-সন্ততীর যন্ত্রণা আর মৃত্যু দেখিয়াছি! বস্তা-বস্তা চাউল চড়াদামে বিদেশে পাঠাইয়াছি, মুঠ ভর্ত্তি টাকায় চুম্বন করিয়া সযত্নে সিন্ধুকে তুলিয়াছি: যুদ্ধ-ফণ্ডে টাকা দিয়া 'রায় বাহাদুর'—'খান বাহাদুর' খেতাব বগলদাবা করিয়াছি। ফুৎকারে মৃত্যুকে ঠেকাইতে গিয়াছি, মরণ-দেবতাকে ভালবাসিয়া অম্লানমুখে আত্মদান করিয়াছি।

বৎসরান্তে নূতন করিয়া প্রস্তুত হইতেছি। নাগরের সুমধুর বংশী-ধ্বনী আমাদের পাগল করিয়া তুলিবে, মৃত্যুর বলডান্সে উন্মাদ করিয়া তুলিবে; এই অম্ল-মধুর চিন্তা আজ মগজের ভাঁজে-ভাঁজে দলা পাকাইয়া স্তূপ হইয়া উঠিয়াছে!

সিরাজ স্মৃতি-দিবস

গত তেশরা জুলাই বাঙলার সর্ব্বত্র সিরাজ-স্মৃতি দিবস বিপুলভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষায় নবাব সিরাজউদ্‌দৌল্লার চেষ্টা বিশ্বাসঘাতকগণের কুচক্রে ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু যে মহান আদর্শ তাঁহাকে দেশের জন্য উন্মাদ-প্রায় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা চিরদিন বাঙালীকে—বাঙালী-জাতিকে অনুপ্রেরণা দিবে। সতেরো বৎসরের তরুণ সিরাজউদদৌল্লা তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করিয়াছিলেন যে, ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক-শক্তিকে চূর্ণ করিতে না পারিলে তাহার প্রভাবে শুধু বাঙলা নয়, শেষে সম্ভবত গোটা ভারতই স্বাধীনতা হারাইয়া বসিবে! তাঁহার এই চিন্তা তাঁহাকে এই ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্বন্ধে এমনি সজাগ করিয়াছিল যে, তিনি কালমাত্র বিলম্ব না করিয়া এই কাল-শক্তিকে চূর্ণ করিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন

কিন্তু মীরজাফর, জগৎশেঠপ্রমুখ তাঁহার আত্মীয়-সেনাপতি-সুহৃদদের ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে তাঁহাকে রাজ্য ও প্রাণ দুই-ই বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। সিরাজের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। তারপর এই তরুণ উচ্চাভিলাষী নবাবকে অপদার্থ ও ঘৃণ্য প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করা হইয়াছিল। কিন্তু সিরাজের দেশবাসী তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই; কোনো কূট প্রচারণাই তাঁহার দেশপ্রেমকে বিমলিন করিতে পারে নাই। বাঙালীর অন্তরও বিভ্রান্ত হয় নাই। তাই আজিও এই তেসরা জুলাই বাঙলার সর্ব্বত্র মিলিত হিন্দু-মুসলিম বাঙালী-জাতি তাঁহাকে স্মরণ করে, বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদদৌল্লাকে প্রণতি জানায়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আচার্য্য-স্মৃতি-তর্পণ-অধিবেশনের সভাপতিরূপে স্যার যদুনাথ সরকার বলেন: আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত একজন ইউরোপীয় শিক্ষিত বাঙ্গালী পূর্ব্ব ও পশ্চিম, নবীন ও পুরাতন উভয়ের সংযোগ রক্ষা করিয়া দুই দিকের যাহা ভাল, তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন—নিজের জন্য শুধু নয়—ভারতবর্ষকে, বিশেষভাবে বাঙ্গলাকে দিবার জন্য!—

কথাগুলি বাস্তবিকপক্ষে বাস্তব সত্য। প্রফুল্লচন্দ্র নিজের সাফল্য আর পরিচিতির চেয়ে সর্ব্বদাই ছাত্রের ভিতর দিয়া নূতন আবির্ভাব-অগ্রগতির কামনা করিয়াছেন। বাজারে-বাজারে—ব্যবসায়ের রকমারি রকমভেদে আজকের জীবনযাত্রাপ্রণালী বিঘ্নসঙ্কুল! অথচ, দেশের উন্নতি—দেশের মানুষের প্রগতি এই পথেই রহিয়াছে। ইহা বুঝিয়াই আজীবন প্রফুল্লচন্দ্র ইহার বিরুদ্ধে লড়িয়াছেন এবং পুনঃ-পুনঃ বাঙালীকে এই পথে অগ্রসর করাইতে যত্নবান ছিলেন। বাঙালী মৌলিক-কিছু করিতেছে না, অযথা তর্কে বিতর্কে আলোচনায় মূল্যবান সময় আর শক্তির নিষ্ঠুর অপচয় করিতেছে, এই দুঃখ তাঁহার আজীবন ছিল। শেষ বয়েসে তিনি দেশীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থ-সঙ্গতি এবং নিজেদের পায়ে দাঁড়াইবার শক্তির অভাব লক্ষ্য করিয়া আক্ষেপ করিতেন। বাঙালীকে কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্ব্ববিভাগ দখল করিতে—বিশেষ করিয়া একনিষ্ঠ সংযম-পরায়ণ, সঙ্ঘবদ্ধ করিতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্র বাঙলা ভাষায় বহু মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং পরিভাষাকে বিজ্ঞানের উপযোগী করিয়াছেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৬ই জুন সন্ধ্যা ৬টা ২৭ মিনিটের সময় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ১৯ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই দিনেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ইহলোক ত্যাগ করেন। এমনি দিনে আমরা বাঙলার দুই শ্রেষ্ঠ সন্তান হারাইলাম: ১৬ই জুন বাঙলার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিল।

১৮৬১ সালের ২রা অগাষ্ট প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ৯ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত তিনি গাঁয়ের

বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৮৭০-এ তাঁহার পিতা হরিশচন্দ্র রায় কলিকাতায় আসিলে তিনি প্রথমে হেয়ার পরে অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন। উপাধি-পরীক্ষার অধ্যয়নের সময় প্রফুল্লচন্দ্র নিখিল ভারতীয় গিল্‌ক্রাইষ্ট ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্যও গোপনে নিজেকে তৈয়ারী করেন এবং ১৮৮২ সালে সাফল্য-লাভ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রার পথ পরিষ্কার করেন। ইংলণ্ডে রসায়ন, পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণিতত্ত্ব অধ্যয়নের সময় প্রফুল্লচন্দ্র 'সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ও পরে ভারতের অবস্থা'—এ-বিষয়ে একটি ছোট বই লেখেন। ইহাতে ব্রিটীশ-শাসনের তীব্র সমালোচনা স্থান পাইয়াছিল।

প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা দেশের শিল্প-সংগঠনে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে। তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্'।

জীবনে প্রফুল্লচন্দ্র অস্পৃশ্যতার ঘোরতর শত্রু ছিলেন। মানুষে-মানুষে সৌভ্রাতৃত্ব আর ঐক্যের দ্যোতক ছিলেন তিনি। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী দেশের যাবতীয় আকস্মিক-বিপদ-আপদে দেশবাসী চিরদিনই এই মহা-মানবকে অতি নিকটে পরম দয়িত হিসাবেই নিয়ত পাইয়া আসিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী, কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। ব্যবহারিক-জীবনে তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক। বাঙলার কাব্য-জগতে তাঁর নাম নিজস্ব স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। তাঁহার ইংরেজি হইতে আহরিত 'ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা' অভিনব পুস্তক। বিদেশীয় ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিগণের অসংখ্য কবিতা তিনি বাঙলায় অনুবাদ করিয়াছেন; সুধীজন কর্ত্তৃক তাঁহার এই সব কাব্য-পুস্তকগুলি অতিশয় সমাদরের সহিত আদৃত হইয়াছে। 'জোনাকী' ও 'পর্ণজা' তাঁর বহুল প্রচারিত কবিতাগ্রন্থ। বাঙলার ও বাঙলার বাহিরের বহু সাহিত্য ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অমায়িকতা ও সরল আচার-ব্যবহার সৌকুমার্য্যে এই প্রসন্নমনা কবি-শিক্ষাব্রতী আমাদের স্মরণ-পথে বহুকাল জাগরূক থাকিবেন।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ইংরেজি ৭ই জুন রাত্রে অল্পকাল রোগভোগের পর তাঁহার লক্ষ্ণৌর বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়েস ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক-রূপে তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ হয়। পরে তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট ও রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের সভ্য ছিলেন।

---

*

আত্মপ্রশংসা মাত্রই দোষার্হ নয়; অনেক সময় আত্মপ্রশংসা আত্মবিশ্বাসেরই এক রূপ। গ্রীক, মুসলমান, ইংরেজ, জার্ম্মান, ফরাসী এঁদের সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যে অল্প পরিচয়টুকু ঘটে তারও ভিতর দিয়ে বুঝতে পারা যায়, আত্মগৌরব-এঁদের কারো ভিতরে কম নয়। কিন্তু এঁদের আত্মপ্রশংসার সঙ্গে এ-কালের বাঙালীর আত্মপ্রশংসা মিলিয়ে দেখলে পার্থক্য ..টি ..টি সহজেই চোখে পড়ে। জগতের বুকে দৃঢ়পদে দাঁড়াবার ও বিচরণ করবার ক্ষমতা থেকে উৎসারিত হয় যে, একটি সহজ আত্মগৌরববোধ, সেই স্বাভাবিকতার প্রভামণ্ডিত আত্মপ্রশংসা এ-কালের বাঙলা সাহিত্যে দুর্লভ; এ-কালের বাঙলা সাহিত্যিকদের আত্মপ্রশংসার মূলে রয়েচে বরং ভাবিকতা—প্রবল প্রতিপক্ষের সামনে নিজেদের বজায় রাখবার একটা চেষ্টা।

—কাজী আবদুল ওদুদ।

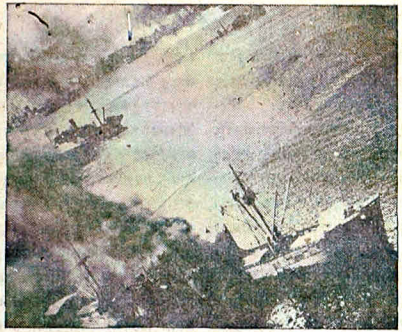

একখানা জাপানী জাহাজ নিমজ্জনের দৃশ্য

মিত্র-বাহিনীর জয়।
আমাদেরি জয়।
সুতরাং দেশের প্রত্যেক
সুসন্তানেরই ইহা কামনা
করা উচিৎ।

নবী দিবস

এস. ওয়াজেদ আলি বি-এ (কেন্টাব) বার-এট-ল

সেদিন আমি এক নবী দিবসের উৎসবে সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলুম। হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম্মের লোকই এসেছিলেন উৎসবে যোগ দিতে আর বক্তৃতা শুনতে। হজরত মোহাম্মদের জন্মতিথির অনুষ্ঠান। সুতরাং ধর্ম্ম জাতি নির্ব্বিশেষে সকলেই তাতে অংশ নিয়ে সেই বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চেয়েছিলেন।

সভার কার্য্য আরম্ভ হল। আমার সুপরিচিত খ্যাতনামা এক মুসলমান সাহিত্যিক এসেছিলেন সে অনুষ্ঠানের প্রধানবক্তা রূপে। তিনি তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করলেন হজরতের জীবনী নিয়ে। বক্তৃতার সে অংশটা সকলেই উপভোগ করেছিলেন। বক্তা যদি হজরতের জীবনের গৌরবময় কাহিনীর মধ্যেই তাঁর বক্তৃতা সীমাবদ্ধ রাখিতেন, তা হলে বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখবার দরকার হতো না। তিনি কিন্তু এমন এক বিষয়ের অবতারণা করলেন যা শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকের মন কষ্টের কারণ হল।

হজরত মোহাম্মদের মহত্ব প্রমাণ করবার জন্য তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মের মহাপুরুষদের চরিত্রের দোষ ত্রুটির উল্লেখ করতে লাগলেন আর ইসলামের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করবার জন্যে বিভিন্ন ধর্ম্মের ছিদ্রান্বেষণে আত্মনিয়োগ করলেন। অমুসলিম শ্রোতাদের মুখের দিকে চেয়ে আমি বেশ বুঝলুম তাঁরা যথেষ্ট মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন। বক্তার কিন্তু সে দিকে আদৌ লক্ষ্য ছিল না। তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে অনর্গলভাবে বিভিন্ন মহাপুরুষের কুৎসা গেয়ে যেতে লাগলেন, আর বিভিন্ন ধর্ম্মের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে যেতে লাগলেন। মুসলমান শ্রোতৃবর্গ উল্লাসের সঙ্গে চিৎকার করতে লাগলেন: "মারহাবা" "মারহাবা"।

সভা শেষ হবার পর বক্তার সঙ্গে আমার বাক্যালাপ হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর বক্তৃতা আমার কেমন লেগেছে। আমি তাঁকে বললুম, হজরত মোহাম্মদের প্রশংসাচ্ছলে ভিন্ন ধর্ম্মের মহাপুরুষদের নিন্দাবাদ করে তিনি হজরতের অবমাননাই করেছেন। একটু বিস্মিত হয়ে তিনি বললেন, সে কি কথা, এর মানে কি? আমি

উত্তর দিলুম, প্রকৃত মহাপুরুষেরা সকলেই এক জাতের, যেমন নিলুকেরাও সকলেই এক জাতের। মহাপুরুষদের মধ্যে উচ্চ নীচ নাই, কেননা তাঁরা সকলেই খোদার ভৃত্য, সত্যের সেবক। তাদের একজনের নিন্দা করলে, অন্যেরা আমাদের প্রতি বিরূপ হন। যে তাঁদের একজনের প্রশংসাচ্ছলে অন্যদের নিন্দা করে, সে তার প্রশংসিত ব্যক্তির নিন্দার পথ সুগম করে দেয়। সুতরাং সে তার প্রশংসিত মহাপুরুষের মিত্র নয়, শত্রু।

ভদ্রলোকটী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, তাহলে আমায় কি করতে বলেন? হজরত মোহাম্মদের বিরাটত্ব কি করে লোকের সম্মুখে ফুটিয়ে তুলবো?

আমি বললুম, তাঁর বিরাটত্ব ফুটিয়ে তুলুন, মানুষের জন্য তিনি কি করেছেন, তার বিশদ বর্ণনা করে। অন্যান্য মহাপুরুষদের ছিদ্রান্বেষণ করে সে কাজ করতে গেলে হিংসা, বিদ্বেষ আর কলহ কোন্দলেরই সৃষ্টি হবে; হজরতের মহত্ব সেভাবে দেখান যাবে না। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা সত্যিকার মহাপুরুষ তাঁরা পরস্পরের সহায়তা করেন, বিশ্বে খোদার রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে। প্রত্যেকে তাঁর নিজের যুগের, নিজের দেশের, নিজের বৈষ্টনীর প্রয়োজনমত খোদার ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করেন। এইভাবে খোদার নির্দেশমত মহাপুরুষেরা সত্যের ক্রমবিকাশে সাহায্য করে থাকেন। তাঁরা সকলেই আমাদের নমস্য। তাঁদের সকলের প্রতি সম্মান দেখালেই আমাদের গৌরব বাড়বে, আমাদের ধর্ম্মের গৌরব বাড়বে, আমাদের কৃষ্টির গৌরব বাড়বে। আর তাঁদের মধ্যে বাচ-বিচার করলে আমাদের তাতে সংকীর্ণতা প্রকাশ পাবে, আমাদের ধর্ম্ম এবং কৃষ্টিকেও লোক অনুদার বলবে। সেকেন্দার বাদশাহকে (Alexander the Great) একজন লোক জিজ্ঞাসা করে, আপনার প্রশংসা সর্ব্বত্র কেন শুনতে পাই? মহানুভব সেকেন্দার বলেন, অতীতের বড় বড় মহাপুরুষদের কীর্ত্তিকলাপ রক্ষার জন্য আমি সচেষ্ট থাকি বলেই লোকে আমার এত প্রশংসা করে থাকে। কোরাণ-শরিফ এবং হজরত মোহাম্মদের জীবনী অভিনিবেশের সঙ্গে পড়লেই বুঝতে পারবেন, ইসলামের নবী অতীতের মহাপুরুষের সুনাম রক্ষা করবার জন্য কেমন সজাগ এবং সচেষ্ট থাকতেন।

এখানে একটা উল্লেখযোগ্য কথা বলি। উপরোক্ত সভায় হজরত মোহাম্মদের বিষয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতা দিয়েছিলেন একজন হিন্দু। তাঁর বক্তৃতায় হজরত মোহম্মদের প্রতি যে অকৃত্রিম ভক্তি এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছিল, প্রধান বক্তার এবং অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতায় তার শতাংশের একাংশও প্রকাশ পায়নি। তিনি বক্তৃতা করেছিলেন হজরত মোহাম্মদের প্রতি বিনীত অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্যে, আর অন্যান্য বক্তারা বক্তৃতা করেছিলেন হজরতকে উপলক্ষ্য করে নিজেদের ব্যক্তিগত এবং জাতিগত অহমিকা প্রকাশ করবার জন্যে। প্রকৃতপক্ষে হজরত মোহাম্মদকে কেবল মুসলমানদের সম্পত্তিরূপে ভেবে এবং প্রচার করে আমরা তার অসম্মান করি, যেমন আল্লাকে মুসলমানদের আল্লারূপে ভেবে বিশ্বপ্রভুর অসম্মান করি। আল্লাকে যেমন বিশ্বের প্রভুরূপে প্রচার করা দরকার, হজরত মোহাম্মদকেও তেমনি বিশ্ববাসীর বন্ধুরূপে প্রচার করা দরকার। এ আদর্শের অর্থ যদি আমরা বুঝি, তাহলে সব ধর্ম্মের এবং সব ধর্ম্মের মহাপুরুষদের সম্মান করতে আমরা বাধ্য হব।

দেশের জন্য, দশের জন্য আত্মোৎসর্গের প্রেরণা এবং ক্ষমতা থাকা চাই। দেশের এবং দশের মঙ্গলের চেয়ে যে নিজের জীবনকে মূল্যবান বলে মনে করে, সে যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাতে পারে না; দেশের সম্মিলিত শক্তি, যাঁরা পরিচালিত করেন, তাঁদের মধ্যে যদি কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং ন্যায়নিষ্ঠা না থাকে, তা হলে সবই পণ্ড হয়ে যাবে।

এস. ওয়াজেদ আলি

তহমিনার চোখ

সমতল

চোখের সামনেই আরেক জোড়া চোখ। ফরিদ ভেবেছিলো, নিজেকে সে আড়ালেই রাখবে, নিতান্ত সন্তর্পণেই সে সকলের মাঝখান থেকে যেমন একদা সরে দূরে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলো, আজও ঠিক সেই ওজনেই নিজেকে সে নিঃশেষে লুপ্ত করে দেবে। কিন্তু সব থেকে বড়ো বাদ সাধলো এই চোখ: এক জোড়া চোখই তাকে অবলুপ্তির সংকেতসমেত কুক্ষীগত করে ফেললো।

মানুষের জীবনে কতো ঢেউ, কতো অবিমিশ্র স্রোত পুনঃ-পুনঃ আসে; আসে সত্যই, কখনো ধীরে—হয়তো খুবই ধীরে, আবার, কখনো পুরোমাত্রার ঝলক তুলে। সত্য শুধু এ-টুকুই যে, স্রোত সে ঠিকই আসে।

ফরিদ জানতো না কিছুই।

আসতে সে চায়নি। তবু আসতেও তাকে হয়েছে। এই গূঢ়-পরিবেষণে হয়তো কারুর অদৃশ্য অজ্ঞাত কোনো রহস্যসূত্র ক্রিয়া-পদ্ধতির ছোঁয়াচ থাকে—হয়তো থাকেই, কিন্তু ফরিদ সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৌতূহলী যেমন প্রথম দিকটায় ছিলো না, আজো সে যে সত্যিই বিন্দুমাত্র সতর্ক নয়, সেটা এতোটা বেশি পরিস্ফুট যে, সে-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতেই পারে না। ফলে ফরিদ হঠাৎ অদৃশ্য হলেও একদিন যেমন কারুর মনে কোনো বিশেষ হৈ-চৈ জাগে নি, অকস্মাৎ আজ কয়েকদিন হলো, সে ফিরে এলেও তেমন কোনো সোরসরগোল হয়নি, বাড়িতেও নয়—তার বন্ধুদের মধ্যেও নয়।

ফরিদ একটানা বেরিয়ে সকলের সংগে আগের আলাপের সুর ধরে নতুন করে পরিচয়টা ঝালাই করে বাড়ি ফিরে এলো।

বড়ো-আপা হেসে জিজ্ঞেস করলেন: কেমন লাগলো রে, সবাইকে?

উত্তর দিতে ফরিদ এলোমেলো হয়ে দ্বিধান্বিত রইলো।

আপা কিছু মনে করলেন না, আবার ডাকলেন, পন্নির সংগে দেখা করলি তো?

পন্নি হামিদার ছোটো বোন।

ফরিদ সম্বিৎ ফিরে বললো: না, আপা। পন্নিরা বাড়ী নেই।

বাড়ী নেই?—মনে হলো বড়ো-আপা বেশ আশ্চর্য হলেন। তিনি উপযাচক হয়েই বললেন: কিন্তু কাল-পর্যন্ত তো ওরা সবাই এখানেই ছিলো।

ছিলো নাকি?—ফরিদ কোনো রকমে কথা দুটো উগড়িয়ে দিলো।

হ্যাঁ, ছিলোই তো। বড়ো-আপা বেশ সরল হয়ে এলেন, বললেন: আমার কি মনে হয় জানিস, ফরিদ? তোর সংগে ওরা আর হয়তো দেখা হওয়াটা পছন্দের মনে করেন না। হয়তো ভাবেন তোর জন্যেই মাত্র হামিদা—

ফরিদ বাধা দিলো। একটু ধীরে বেশ শক্ত সুরে ডাকলো: আপা, এটু থামো লক্ষী।

বড়ো-আপা আর কিছু বলবার আগেই ফরিদ পা বাড়িয়ে ভেতর-বাড়িতে ঢুকে পড়লো।

একখানা ঘর পার হয়ে সামনে আরো এগিয়ে ফরিদ সামনের বারান্দায় গেয়ে থামতেই বড়ো-ভাবী মিন্টুর-মা পাশ দিয়ে সংকোচিতকণ্ঠে

বললো : মিনার কথা তোমার মনে আছে, ছোট-ভাই ?

ফরিদের ইচ্ছে ছিলো না, মিন্টুর-মার সংগে সে কথা বলবে, তেমন মেজাজ তার তো বেঁচে ছিলো না ; কিন্তু বড়ো-ভাবীর মুখে 'ছোট-ভাই' সম্বোধনটাই শুধু তাকে সামান্য আটকালো এবং সে একটুখানি পল্‌কা হয়ে বললো : ঠিক ধরতে পারিছিনে, ভাবী।—সম্পূর্ণ এভাবে সরে গেলে বেয়াদপি হবে ভেবে সে আরো ধীরে জিজ্ঞেস করলো : সবটুকু নামটা কি বলো তো ?

মিন্টুর-মা দীর্ঘ চার বছর পরে ফরিদকে তার সংগে কথা বলতে দেখে পুরোমাত্রায় খুশিতে ভরে উঠলো, বললে তাড়াতাড়ি : তহমিনা। ওঁর মা, মিসেস তহসিনার কথা-তোমার মনে নেই, ভাই ? বড়ো-আপার সঙ্গে হন না তিনি ?

ফরিদ বললো : বুঝতে পারছি। মিনির কথা বলচো তো ?

হ্যাঁ ভাই।—মিন্টুর-মা আরো বললো : সে মিনি আর নেই, এখন ওটা কতো বড়ো হয়ে গেছে !

এই চার বছরে ?—হঠাৎ আলগা হয়ে ফরিদ জিজ্ঞেস করলো।

ফরিদের জিজ্ঞেস করবার ভংগিটা মিন্টুর-মার ভালো লাগলো। বললো মুখে : বারে, চারখানা বছর এমন কম আর কই হলো ?

ফরিদ জিজ্ঞেস করলো : মিনিটা বুঝি বারান্দায় আছে ?—মিন্টুর-মা বললো : তা আছে। কিন্তু দোহাই তোমার ছোট-ভাই, মিনার সামনে যেন আবার মিনি ডেকে বসো না।

কেন ?—প্রশ্ন না করলেও হয়তো চলতো, তবু প্রশ্ন এলো মুখে, ফরিদ জিজ্ঞেসও করে বসলো।

ম্যাট্রিক পাশ করেছে ফার্স্ট ডিভিশনে, তার ওপর পেয়েছিলো স্কলারশিপ, কয়েকদিন পরেই দেবে আই-এটা। মস্ত ব্যাপার যে ! তহমিনাকে মিনা বললে খুশি হয়, মিনি বললে ভারি খেপে যায়, বড়ো হয়েচে কি না !

মিন্টুর-মা চলে যেতেই ফরিদ বারান্দায় পা চালিয়ে দক্ষিণ কোণে গিয়ে পৌঁছুলো।

ঝাপসা রোদের আমেজ গায়ে মেখে তহমিনা উলের পুলওভার বুনচে, হাতের কাঠি শুধু উঠচে-নামচে, ডান হাতের বাঁ হাতের এক-একটা আঙুল মাঝে-মাঝে সুতো পরিয়ে দেয়ার জন্যে এমনভাবে নড়চে, ফরিদ খানিক সময় জানান্ না দিয়ে সে আবহাওয়া উপভোগ করলো।

রেলিংটায় শরীরের ভার ছেড়ে দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থেকে ডাকলো : তহমিনা ?

তহমিনা ! তহমিনা তো রীতিমত চমকে উঠলো, এখানে সবাই তাকে ডাকে মিনা বলে। তহমিনা বলে কোনো নাম যে তার আছে, সে কেবলমাত্র কলেজের খাতায়,—কলেজ ফীস জমা দেয়ার সময় মাসে একবার—বছরে বারোবার মাত্র সে অই সম্পূর্ণ নামটা লিখতে অবসর পায়—ভাবতে অবসর পায় যে, তার সবটা নাম বেশ বড়ো, সবটা নামের ডাক বেশ ভরাট শোনায়। সে নাম তো এখানে হারিয়ে আছে। সে-নামে এখানেই কে ডাকলো, কেউ তো ডেকেচে স্পষ্ট মনে হলো !

মুখ ফিরিয়ে সে পাজামা-আচকান পরিহিত ফরিদকে দেখতে পেলো। মুহূর্তেই সে রক্ত-রাঙা হয়ে উঠলো। একি ব্যাপার ! ফরিদ-মামার বাড়িতে তো এমন অপরিচিত কোনো মানুষ বিনিএত্তেলায় আসতে পারে না। কে এ লোকটা ! অই কি ডেকেচে তাকে, তহমিনা নামে ? তহমিনা নামে ! তহমিনা যা কোনোদিন

করেনি, তার জীবনে—হঠাৎ বিষম ভয়ে ভয়ংকর হকচকিয়ে সে হাত বাড়িয়ে মাথায় আঁচল টেনে দিলো। এমন অপরিচিত লোকটা কি করে ঢুকলো ভেতর-বাড়িতে, কি করে সোজা চলে এসেচে ভেতর বারন্দায়, কোন্ সাহসে এসেচে ?

কোনো উত্তর না পেয়ে, বরং নানা ধাঁচের খসখসে শব্দ শুনে ফরিদ বুঝতে পারলো, সকলের বেলায় যে-ভুল হয়েচে—তহমিনাও সেই ভুলের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। তার আরো ভয় হলো, তহমিনা নিশ্চয়ই ভয় পেয়েচে, তাকে স্পষ্টতই সে চিনতে পারে নি—ভয় হলো, হয়তো ঘুরে দাঁড়ালেই—হঠাৎ ফরিদের হাত তার দাড়িতে আটকে গেলো। দাড়ি, সর্বনাশ, দাঁড়িশুদ্ধি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেই তো তহমিনা নির্ঘাৎ চীৎকার করে উঠবে। চিনতে-যে তাকে পারেনি, ফরিদ তা স্পষ্ট অনুভব করতে পারলো। অপরিচিত মানুষ মনে করেও তহমিনা যে দৌড়ে পালায় নি, পালাচ্ছে না, এটা মনে করে ফরিদ খুশিই হলো।

মুখ না ফিরিয়ে সে ডাকলো : জবাব দিলিনে মিনি-মুখপুড়ী, চিনতেও কি পারলি নে !

মামা !—তহমিনা ভয়ে-আশংকায়, আনন্দে-হর্ষে চীৎকার করে উঠলো। ছুটে এসে ফরিদকে জাপটে ধরলো, কিন্তু মুখ ফেরানোর সংগে-সংগেই তহমিনা অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে সরে দাঁড়ালো। অব্যক্ত যন্ত্রণার সংগে ফরিদ দেখলো, তহমিনা যেমন দ্রুত আনন্দোৎফুল্ল হয়ে ছুটে এসেছিলো, ঠিক তেমনি করে সমান ওজনে সহ্যাতীত আঘাত পেয়ে সে সরে যাচ্ছে, সরে গেলো। শুধুমাত্র সে প্রথমটায় এসেছিলো দ্রুত, ফিরে যাওয়ার সময় তার গতি হলো স্তিমিত, শংকাতুর।

ফরিদ তহমিনাকে এতোখানি আকস্মিকতার সংগে অভিনব নাটকীয়ভংগিতে অভ্যর্থনা করবে আশা করে নি। দাড়ি না হয় রয়েইচে, কিন্তু কই তার জন্যে আর কারুর তো তাকে চিনতে কিংবা চেনার পর এতো বেশি বিস্মিত-ব্যথাতুর হতে হয়নি !

তহমিনা কেন অমন করলো ?

তেরো-চৌদ্দ বছরের তহমিনা, তার মিনি-মুখপুড়ী মাত্র চারটে বছরের মধ্যে কী পরিবর্তনের মধ্যেই না এসে দাঁড়িয়েচে। সতেরো-আঠারো বছরের তহমিনা গম্ভীর হয়েচে, বেণী-দুলোনী সেই ছোট্ট মিনি-খুকী আর নেই। গম্ভীর মেয়ের মুখে-চোখে আনন্দ কতো—ভাবগম্ভীর সৌন্দর্য কতো, এ তো কই ছিলো না মিনি-খুকীর মুখে-চোখে ! তার ওপর মাথায় কাপড় রেখেচে। মাথায়-কাপড়তোলা মিনির মুখ, দাড়িশুদ্ধ ফরিদ এক মুহূর্ত ভাবলো, মেয়েদের মাথায় কাপড় দেয়ার চলন যিনি করেছিলেন তাঁর সৌন্দর্যজ্ঞান এতো জমাট হয়েছিলো কিসের প্রেরণায় ? যিনি প্রচলনে উদ্যোক্তা ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই ছিলেন পুরুষ, কারণ এই ভালো-লাগাটা তো তার চোখই প্রমাণ করতে এগোলো—এগিয়েচে। ফরিদ ভাবলো, তহমিনাকে বলবে তার আঁচলে-ঢাকা মুখের কথা, মুখের সৌন্দর্যের কথা। কিন্তু তার পূর্বে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই তহমিনা ছুটে বেরিয়ে গেলো।

ফরিদ দেখেছিলো, তাই সে বিস্মিত হলো না। সে দেখেছিলো তহমিনার মুখচ্ছবি। নিতান্ত ব্যথা-ক্ষুব্ধ কাতর যে যন্ত্রণাস্ফুট ছায়াভাষ তার মুখে ফুটে উঠেছিলো, কেন তার প্রকাশ শুধু তহমিনার মুখেই এতো বেশি আঁকিয়ে উঠলো !

বড়ো-আপা কয়েকটা কথা বলেছিলেন, সকালের দিকে তাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে তিনি বলেছিলেন : কতোদিন হলো সহরের দিকে পা দিয়েচিস্ ?

কেন বলো তো?—ফরিদ অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলো।

যদি বলি, অমনি জিজ্ঞেস করচি!

মুখের দিকে চেয়ে থেকে ফরিদ বললো: তা-হলেও সত্যি উত্তরই পাবে। দরগা থেকে বার হয়েচি দিন পনেরো হবে, হেঁটে রাস্তা পার হয়েচি ন-দিন, তারপর ঘোড়ার গাড়িতে—মোটরে—ট্রেণে—ষ্টীমারে দিন পাঁচেক নষ্ট করে শহরে পা দিয়েচি গতকাল বলতে পারো।

ও, তাই বলো।—বড়ো-আপা যেন স্বস্তির নিঃশেষ ছাড়লেন।

ফরিদ জিজ্ঞেস করলো: অমন করলে যে বড়ো? কেন, শহরে পা দিয়েচি তাতে দোষ কি করেচি আমি?

না না। তা ঠিক নয়। আমি বলচি, তোর দাড়ির কথা।—হাতের কাজটায় হঠাৎ বেশি ঝুঁকে পড়ে বড়ো আপা তাঁর কথা শেষ করলেন।

ফরিদ বললো: দাড়ির কথা?

সুঁচে সুতো পরাতে-পরাতে বড়ো-আপা দাঁতে-চাপা গম্ভীর সুরে সায় দিলেন: হুঁ!

কেন, দাড়ি কি করেচে?—ফরিদ দাড়িতে হাত চালাতে-চালাতে জিজ্ঞেস করলো।

করেনি কিছুই। কিন্তু অই দাড়িগুলো তুই পুষবি বলে রেখেচিস্ নাকি?—বলার সুরে কঠিনতা বা সরসতার রেয়াজ যেটাই হোক ফরিদ ভালো ধরতে পারলো না।

দাড়ি পুষবো মানে!—ফরিদ বললো: দাড়ি আবার কেউ পোষে নাকি? দাড়িতো আপনি হয়, ও তো আপনিই থেকে যায়। ইচ্ছে করলেই কি ও বাড়ানো যায়!

কেউ তোকে কিছু বললো না?—উত্তরটা পেতে বড়ো আপা উদ্‌গ্রীব হন।

না!—ফরিদ মাথা নেড়ে জানায়।

ফরিদের উত্তর শুনে বড়ো আপা কিছু বললেন না আর। ফরিদ অল্প সময় চুপ করে থেকে পূর্ব কথার সুর ধরে জিজ্ঞেস করলো কেন জিজ্ঞেস করচো ও-কথা?

অমনি নয়।

ফরিদের মনে হলো, বড়ো-আপা গম্ভীর হতে চেষ্টা করচেন। জিজ্ঞেস করলো সে: কি ব্যাপার বলো তো, আপা?

হোসেন তোর কথা জিজ্ঞেস করছিলো।—বড়ো-আপা উত্তর দিলেন।

কি জিজ্ঞেস করেচেন, বড়ো ভাই-সাহেব?—ফরিদ জানতে চাইলো।

তুই কি সত্যিই দাড়ি রাখবি মুখে, তাই মনে করেচিস্ নাকি?—বড়ো-আপা জিজ্ঞাসু হলেন।

কি আশ্চর্য!—ফরিদ বললো: তোমরা সব দাড়ির ওপর খেপেচো কেন? আমার চেয়ে আমার দাড়িটা তো আর বড়ো জিনিস হলো না, তবে? কি এসে-যায় ওতে?—ব্যাপারটা নিতান্তই সাধারণ স্তরের, ফরিদ তার কণ্ঠস্বরে তাই বোঝাতে চায়।

বড়ো-আপা আবার সংসার-বুদ্ধির ছোঁয়াচে বলসে উঠেন, মুখে বলেন: জানিস ভাই, তোর বয়েসে ও-সব মানায় না।

কি বলচো, বড়ো-আপা?

একটু সাধারণ হ' ভাই, আমাদের মতো হ'। বড়ো-আপা খুব বেশি সরল আর আন্তরিক হয়ে ওঠেন: তোরা পুরুষ-মানুষ, তোদের জীবন কতো বড়ো। সংসারে থাকতে হলে সংসারের মানুষদের ভালোবাসতে শেখ, আমাদের আব্দার তোকেও তো রাখতে হবে।

কি যে বলচো আপা।—ফরিদ লজ্জিত হয়ে উত্তর দেয়।

সত্যি কথাই বলচি। শুধু কি আমরা ভালোই বাসবো? আমাদেরও ভালোবাসতে সুযোগ দে।

যারা তোকে ভালোবাসতে চায়, তাদের সম্পর্ক তুই এড়াবি কেন? এড়ানোয় এমন বাহাদুরী কি আছে ভাই, যাতে তুই নিজেও হতে পারবি খুশি?

ফরিদ মুখড়ে পড়ে।

বাস্তবিকই সংসারের মানুষের বিরাগী স্বভাব যে তরংগ জাগায়, তা সহের অতীত। মৃত্যু অবধারিত বলেই কি তাকে জপতে হবে সর্বসময়! মৃত্যু অবধারিত বলেই তো বাঁচার উত্তেজনাকে সর্বব্যাপী করতে হবে জীবনে-চলনে-বলনে, সংসারে। মানুষের সম্বন্ধবোধ-সম্পর্ক-বোধ মানুষের অন্তরে যে অনাবিল আনন্দ-রসের ঝংকার তোলে, তাকে অস্বীকার করার কোনো অর্থ হয়।

তবু সে নিজেকে সাহসী করে তোলে, মুখ না তুলেও বলে: তুমি খুব বেশি বড়ো করে দেখচো, আপা।

বড়ো করে নয়, সহজ করেই বলচি। তুই ভাই, ছোটো-ভাই, আমরা কি ভেবেচি কোনো দিন তোকে দেখবো অমন করে?

কেন? কি এমন অদ্ভুত হয়েচি আমি? আশ্চর্য, তোমরা এতো সহজে সব ভাসিয়ে দিতে পারো!—ফরিদ নিজেকে বাজিয়ে প্রকাশ করতে চাইলেও বড়ো-আপা তেমন গা করলেন না।

ভাসিয়ে দিতে পারি?—অদ্ভুত জড়তায় বড়ো-আপা একাকার হয়ে উঠলেন। ফরিদ তাঁর কথা বলার ধরণ দেখে বিস্মিত হলো। চোখ তুলতেই সে দেখতে পেলো বড়ো-আপা তার দিকে চেয়ে নেই। বাইরের দিকে চেয়ে-চেয়ে তিনি কেমন যেন নরম হয়ে এলেন, বললেন: হয়তো ভাসিয়েই আমরা দেই, হয়তো অই-ই আমাদের ধর্ম। কিন্তু তোরা তো পুরুষ, তোরা কেন এতো ভীতু—

ফরিদ ডাকলো: আপা।

যাঃ, কী সব বলচি তোকে।

আপা?

কি বলচিস্?

ওরা কেন গেলো?

কেন গেলো?

একটু ভেবে নিয়ে সে বললো: হ্যাঁ।

হয়তো ওরা তোকেই দোষী মনে ভাবচেন।

তুমিও তা বিশ্বেস করো?

আমি?

ফরিদ কিছু বললো না।

না।—অনাহুতভাবেই তিনি বললেন: আমি কি করে বিশ্বেস করবো? আমি তো তোকে জানি; আর হামিদা, হামিদা তো—

আপা!

ফরিদ হারিয়ে গেলো।

এলোমেলো সে সুস্থির হতে চাইলো, কিন্তু কিছুই হলো না। অই নামটা কতো মধুর। কতো রহস্য, কতো অপার্থিব স্নেহ-প্রীতি অই নামের স্তরে-স্তরে পুঞ্জীভূত হয়েছিলো, আজো তো তার উদ্দেশ পাওয়া গেলো না। মনে হয়, জীবন যেন বিস্তারিত হয়েচে একদিন নানা ছন্দে: রামধনুর রূপ-লাবণ্য অশেষ পুলকে উৎফুল্ল হয়ে উঠেচে শুধু একখানি জীবনের সফলতার জন্যে। কতো প্রগাঢ় মমতায় এই রহস্য সুষমামণ্ডিত, কতোখানি সুরম্য সরলতা রয়েচে সামগ্রিক জীবনের প্রত্যেক অংশে, কবে কোন শুভলগ্নে তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে!

কিছু বলবি নে?—বড়ো-আপা নিজেই উদ্যোগী হলেন। তিনি জানতে চাইলেন কিছু, যার ভেতর ফরিদ একাকী লুকিয়ে রয়েচে এতো-কাল, যার সন্ধান সে কারুকে দেয়নি।

আপা, তোমাকে বললে তোমার বিশ্বেস হবে না। কিন্তু সত্যিই আমি কিছুতেই সুস্থির হতে পারচি নে।

কেন চেপে যাচ্চিস্ নিজেকে? মুখ খোল,

যা ইচ্ছে তোর বল। ভালো হোক, মন্দ হোক একটা বিহিত তার আছেই জানবি।

বিহিত? বিহিত হয়তো ঠিক চাচ্ছি নে। ফরিদ সহজ হতে যেয়েও কেমন পাকিয়ে এলো, বললো একাকী: আমি বোঝাতে পারচিনে। কি বলবো? কেমন করে বলবো?—মমতায় ফরিদ নরম হয়ে এলো: তুমি তো জানতে কি আমি চেয়েচি। তুমি তো জানতে খুকীকে।

জানতাম।—বহুদূর থেকে উত্তর এলো। বড়ো-আপা নিরুত্তাপ থেকে জবাব দিলেন।

কেন এমন করে গেলো খুকী?—কোনো উত্তর না পেয়েও ফরিদ লুটিয়ে পড়লো: কেন গেলো সে?

উত্তর সে চাচ্ছে না।

ফরিদ নিজেকে ম্যুনানসই সহজ করে আনতে পারচে না। যা সে চেয়েছিলো—কিছু সে নিশ্চিত চেয়েচে—যা সে চেয়েছিলো তার সহজ কোনো রূপ তার কাছেও স্পষ্ট নয়। তাই নিতান্ত সহজ ভাবেই সে কিছু বলচে, কিছু বলতে চাচ্ছে!

অই তোর চিন্তা?

ফরিদ চোখ তুলে তাকালো।

এখনো মনে হয় তাকে বেশি করে?—কেমন একরোখা তীর্যক ঢঙে বড়ো-আপা হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

সাধারণ করে ফরিদ এমন প্রশ্নে নিজেকে আহত অনুভব করে। কিন্তু বড়ো-আপার বলার ঢং আর গলার স্বর তাকে আমোদিত করলো। ধীরে সে বললো: 'এখনো তাকে মনে হয় বেশি করে'! খুব সুন্দর কিন্তু, অনেকেই তো জিজ্ঞেস করলো, এমন করে তো কেউ জিজ্ঞেস করে নি।—আঙুলে-আঙুলে পাক দিয়ে ফরিদ বললো: জানো আপা, তোমরা যখন ভাবো আমার কথা, যখন প্রশ্নে আমাকে সজাগ করতে চাও, তখন আমি কি ভাবি?

বড়ো-আপা মুখ তুললেন, চোখ তুলে তাকালেন।

ভাবি, এমন করে আমার সম্পর্কে তোমরা কেন ভাবো? কেন ভাবচো? কেন?

জবাব চাস্?

দেবে, আপা?

একদিন তোকে যে অবহেলা আমরা দেখিয়েচি, আজ তার জন্যে দুঃখে আমাদের মন ভরে উঠেচে।

তোমরা?

সে-দিন তুই আমাদের মধ্যে জড়ো হয়ে আসতে চেয়েছিলি। আমরা তোর পছন্দের দাম দিই নি, তোকে সাধারণ করেও কোনো মূল্য আমরা দিই নি।

আজ কি করবে, ভেবেচো?—ফরিদ অমনি জিজ্ঞেস করলো, কথার মাঝখানে দাঁড়িয়েই সে জিজ্ঞেস করলো। তার মন বলছিলো, অকারণ এ-প্রশ্ন, তবু সে জিজ্ঞেস করলো।

এখনো কিছু ভাবি নি আমরা।

ভাবো নি?

না রে।

তবে, কেন জিজ্ঞেস করো মাঝে-মাঝে এমন সব প্রশ্ন?

আগে তোকে কতো সহজেই জানতে পারতাম, কতো কাছাকাছির মানুষ ছিলি তুই। কিন্তু আজ তোকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না,—কেমন দূরে চলে গেছিস্।

আমি কিন্তু তোমাদেরই আজ চিনতে পারচিনে। তোমাদের সংসার, তোমাদের কথা-বার্তা সবই এমন লাগচে—

নতুন-নতুন মনে হয়?—খোলাখুলি আলোচনায় বড়ো-আপার উৎসাহ চিরদিনের।

না।—এতো বেশি অদ্ভুত—আজগুবি মনে হয়

যে, একেক সময় ভেবেচি, তোমরা হারিয়ে গেছো, সত্যিকারের কোনো রূপ তোমাদের নেই—মনে হয়, কোনো-কালেও ছিলো না।

বড়ো-আপা মুখ তুলে ফরিদকে লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর মুখ অজ্ঞাত বেদনায় নীল হয়ে উঠেচে, ফরিদ তা লক্ষ্য করে নি। ফরিদের আলোচনা বড়ো-আপাকে বিস্মিত করে নি। শুধু তিনি একাকী নিবিড় হয়ে উঠতে চাচ্ছিলেন।

কিন্তু যে-ভাবেই তুই আমাদের যাচাই করিস নে কেন, ফরিদ, এ-কথা সত্যি, আমরা সত্যিই তোর আপন। আমাদের নিয়েই তোর সংসার।

সংসার!

ফরিদ, কয়েকদিন হলো তুই এসেচিস্। আপনিই চলে গিয়েছিলি, আপনি তোকে ফিরতে হয়েচে। তবু ভালো ভাই, তুই ফিরেচিস্।

পা ছড়িয়ে, দেয়ালে মাথা হেলিয়ে ফরিদ সহজ হয়ে বসলো।

আর অভিমান করিস্ নে। এ-বার তুই বল্ আমরা কি করবো?

কোনো উত্তর না পেয়ে বড়ো-আপা ডাকলেন: ফরিদ?

কেন জিজ্ঞেস করচো অমন করে? আমি তো ভাবতেই পারি নে, নতুন-কিছু আমি। আমি আগের মতোই আছি, তোমাদেরও তেমনি দেখতে দাও।

কই আর আছিস্, ভাই। যে-ভাবে কথা বলচি, এমন অনাত্মীয়ের সুর আর কখনো এসেচে আমাদের কথায়!···আসেনি।

ও তোমার মনের ক্ষোভমাত্র, আপা। আমি তো জানি, তুমি কতো ভালোবাসো আমাকে।

ফরিদ?

বলো, আপা।

বিশ্বাস করিস্, আমাকে?

কি যে বলো, তুমি।—ফরিদ উঠে এলো, হেসে বললো,—হাত বাড়িয়ে বড়ো-আপাকে সালাম করলো সে।

বেঁচে থাক্, ভাই।—পায়ের ওপর থেকে হাতটা তুলে নিয়ে বড়ো-আপা বললেন: তুই আমাদের ছোটো-ভাই, আল্লার সমস্ত স্নেহ-মমতায় তুই এতো বড়ো হয়েচিস্। আজ আল্লার অবর্তমানে তোকে আমি অযত্নে-অপমানে বাড়ি থেকে বার হয়ে যেতে বাধ্য করেচি, এ-ভাবতেও যে—

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ফরিদ দু-হাতে তাঁর হাত দুটো জড়িয়ে রেখে রুদ্ধকণ্ঠে বললো: এই ভুল আমিও অনুমান করেচি বড়ো-আপা।

তুই?

হাঁ। কেন যেন আমার মনে হয়েচে, আমি বাড়ি ছেড়ে এসে কি ভালো করেচি! ভালো করেচি? উত্তর পাইনি, কিন্তু মনও মানে নি। আজ বুঝতে পারচি, কতো বড়ো ভুল আমি করেচি।—মুখ তুলে সে বললো: আপা, তুমি কি করে ভাবতে পারলে, তোমাকে দোষী ভেবেচি আমি? আমি তোমার ওপর অমন নোঙরা বোঝা চাপাতে পারি কখনো? তোমার নিশ্চয় বিশ্বাস হবে যে, আমি ফিরেচি শুধু তোমার কথা স্মরণ করেই।

এতো ভালোবাসিস্ আমাকে তুই?

তুমি হাসো, আপা।

তা হাসছি, বাপু। কিন্তু তুইও সহজ হ'।

আপা।

তোর দিকে তাকাতে পারচি নে, ভাই। কতোই-বা তোর বয়েস, অথচ চোখে-মুখে তোর যেন জীবনের ছাপ পড়ে গেছে, রে।

এ-দিক থেকেই আমি এখনো একেলা। মনের দিক থেকে এতো পরিবর্তন এলো কেন? মনের পরিবর্তন আজ চোখে-মুখে ফুটে উঠেচে, সবায়ের

চোখে আজ যা ধরা পড়চে, সে তো মোটে চার-খানা বছর আগেও ছিলো না।

তুই ইচ্ছে করে নিজেকে বুড়িয়ে তুলচিস্।

না, আপা।

নয় কেন?

এ এক অদ্ভুত রহস্য। খোদা নাকি বলেছিলেন, তাঁর সৃষ্ট জীবদের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। বিশাল স্থলচর-জলচর প্রাণীদের চেয়ে ছোটোখাটো সাধারণ মানুষ মহৎ-মহান। মানুষ কী যে চিন্তা করে, কার আশায় যে, তাদের সমস্ত কার্যক্রম নিরূপিত হয় আনন্দে-উল্লাসে—শোকে-দুঃখে আজো তার সন্ধান সত্যিকারভাবে পাওয়া যায় নি।—ফরিদ বললো: আপা, তুমি ভাবো না? তুমিই তো বলেচো আমাদের মনে আছে যে, তোরা বড়ো হবি—একদিন কতো বড়ো হবি, সে-দিন দেখবি, জীবন কি, কতো জীবন। মানুষ হয়ে জন্মেচি, খোদাকে শোকর। বিশাল পৃথিবীর নিঃস্বতম মানুষও অবহেলার নয়, কারণ তার মন অবিনশ্বর। এই মন তাকে মহীয়ান করে তুলবে।...তোমার মনে পড়ে না আপা?

পড়ে।

তোমার কাছ থেকেই আমরা সব পেয়েচি। আব্বার কাছ থেকে যেটুকু পাইনি, তুমি সুদে-আসলে তা পুরিয়ে দিয়েচো। তোমাকে ভুলবো কোনোদিন, তোমাকে অপমান করবো কোনো-দিন! কেমন করে ভাববো বলো? কেমন করে ভুলবো তোমার একটিও কথা?

আজ কেন বলচিস্ এ-সব কথা?

তুমি বিশ্বাস করো, তোমার সাহায্যে আমি বড়ো হয়েচি। আজ আমি পাগল হয়ে পড়েচি। কি যে করবো বুঝতে পারচি নে। যে-চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় চারটে বছর পাতি-পাতি করে ঘুরে বেড়িয়েচি পথ-ঘাট, তার শেষ হয় নি আজো, আপা। তুমি পারো নাকি, শান্তি দিতে—তুমি পারো নাকি সত্যি-কিছু বলতে, যাতে এমন নির্বাক যন্ত্রণা থেকে আমি ছাড়া পেতে পারি!

বড়ো-আপা হাত বাড়িয়ে ফরিদকে কাছে সরে আসতে বললেন। ফরিদের কাঁধ স্পর্শ করে তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

সন্ধ্যে হয়েচে।

সন্ধ্যের শুরুতেই দুটো-একটা করে তারা আকাশে উঠ্‌চে। নীল আকাশ কতো প্রশস্ত, কতো নীল আর কতো শান্ত। ফরিদ বড়ো-আপার স্পর্শে আকুল হয়ে উঠলো।

ফরিদ খুব বেশি একাকী হয়ে পড়লো। যা সে সব থেকে ঘৃণা করতো, সেই নিশ্চুপ-নিস্তব্ধ-তাকেই সে তার জীবনে যেন সুউজ্জ্বল করে তুলছিলো। মন তার অশান্ত ছিলো। কোন্ আশায় সে ফিরে এসেচে, তাও ভালো করে সে ভাবতে পারে নি আজো। সবই সহজ, সোজা, তবু, সুদীর্ঘ চিন্তা কোনো তাকে পাকিয়ে-পাকিয়ে অশান্ত করে তুলচে। ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর সব আলোড়ন তার চক্ষুর সামনে একত্রিত হয়ে গেলো। নিজেকে কেমন নিঃসম্বল, পূর্বাপর বিবেচনাহীন অথর্ব ভেবে সে অকারণেই সংকুচিত হলো। কিন্তু তবু নিজেকে সে কোনো প্রকারেই বুঝিয়ে উঠতে পারলো না, কেন সে এমন করে আলোড়িত হচ্ছে। প্রথমটায় সে ভেবেছিলো, সে নিজে যখন সহজই রয়েচে, তখন কোনো আব-হাওয়াই সংসারের আর সবায়ের সংগে নিবিড় হয়ে যেতে কোনো প্রতিবন্ধক দাঁড় করাতে পারবে না। কিন্তু তাও কই, কিছু তো হলো না।

ক্রমশঃ

পাঞ্জেরী

ফররুখ আহমদ

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?
এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?
সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
অসীম কুয়াশা জাগিছে মোদেরে ঘেরি'।

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?

দীঘল রাতের শ্রান্ত সফর শেষে
কোন্ দরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা প'ড়েছি এসে?
একী ঘন-সিয়া জিন্দিগানীর বাঁধ
তোলে মর্সিয়া ব্যথিত দিলের তুফান-শ্রান্ত খা'ব
অস্ফুট হ'য়ে ক্রমে ডুবে যায় জীবনের জয়ভেরী।
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি।

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?

বন্দরে ব'সে যাত্রীরা দিন গোণে,
বুঝি মৌসুমী হাওয়ায় মোদের জাহাজের ধ্বনি শোনে;
বুঝি কুয়াশায়, জ্যোছনা-মায়ায় জাহাজের পাল দেখে।
আহা পেরেশান মুসাফির দল
দরিয়া কিনারে জাগে তক্‌দিরে
নিরাশায় ছবি এঁকে।

পথহারা মোরা দরিয়া-সোঁতায় ঘুরে
চ'লেছি কোথায় ? কোন সীমাহীন দূরে ?
মুসাফির দল ব'সে আছে কূল ঘেরি।
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে ;
একাকী রাতের ম্লান জুলমাত হেরি।

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী ?

শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে
দরিয়া-অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি'
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী ;
মোদের খেলায় ধূলায় লুটায়ে পড়ি'
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী।

সওদাগরের দল মাঝে মোরা উঠায়েছি আহাজারি,
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দনধ্বনি আওয়াজ শুনি যে তারি।
ওকি বাতাসের হাহাকার,—ওকি রোণাজারি ক্ষুধিতের !
ওকি দরিয়ার গর্জন,—ওকি বেদনা মজলুমের !
ওকি ক্ষুধাতুর পাঁজরায় বাজে মৃত্যুর জয়ভেরী !
পাঞ্জেরী !
জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রূকুটি হেরি
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রূকুটি হেরি
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী, কত দেরী ॥

———

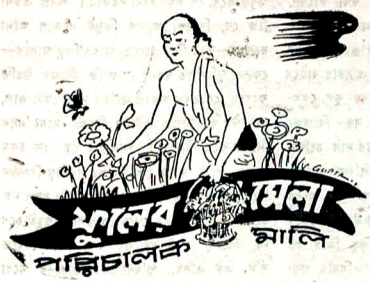

তারকার পথ

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
(প্রবাসী সম্পাদক)

মার্কিণ দেশে এক প্রবাদ-বাক্য আছে 'Hitch your wagon to star'—"গাড়ি তারকার সঙ্গে যোজনা কর"—অর্থাৎ যদি কোন আদর্শ বা উদ্দেশ্য নিয়ে চলতে চাও তবে সেটা যত-দূর সম্ভব উঁচু হওয়া দরকার। সাধারণতঃ লোকে মনে করে একথাটা আমাদের এই দেশে খাটে না। কেননা, আমাদের এই দেশ, এমনকি আমাদের দেশটা যে মহাদেশের অংশ সেই এসিয়ার মহাভূমিও নৈরাশ্যের ঘরবাড়ি। এই অভাগা দেশে নাকি যে যত বড় আশা নিয়েই জন্মগ্রহণ করুক, যার শৈশবে কৈশোরে এবং যৌবনে যত বড় আদর্শই গড়ে উঠুক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত সব আশাই পণ্ড হবে, সকল আদর্শ সকল চেষ্টাই বিফল হতে বাধ্য। সুতরাং এদেশে তারকার পিছনে ছুটে যাওয়া নির্বুদ্ধিতার কাজ, তার চেয়ে বরং মাটি আঁকড়ে নিচের দিকে মুখ করে কোন প্রকারে বেঁচে থাকাই ভাল। অনেক বুদ্ধিমান লোকে একথা বলে, অনেক পণ্ডিত লোকেও এরকম ভাবে; কাজেই এসিয়ায় যে জন্মগ্রহণ করেছে তার পক্ষে অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করা বৃথা, বরঞ্চ তার যদি বুদ্ধি থাকে, তা হলে তার উচিত সকল দুর্দশা সকল অবনতি কপালের দোষ বলে মেনে নিয়ে ঘানির বলদের মত রোজকার বোঝা টেনে চলেই জীবন সার্থক করা। যে সকল বিদ্বান লোক একথা বলেন, তাঁরা কিন্তু একবার ভেবেও দেখেন না যে, মানুষের উন্নতির জন্য, মানুষের পশুভাব নষ্ট করে তার মনের ও চরিত্রের বিকাশের জন্য, মনুষ্য সমাজের গঠনের ও সংস্কারের জন্য এই পৃথিবীতে যত মহামানব ঈশ্বরের প্রেরিত বা তাঁহার জ্যোতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন সময়ে এসেছেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই এই পবিত্র এসিয়া ভূমিখণ্ডেই জন্মগ্রহণ করেন। আজও সারা পৃথিবীময় ধর্ম্ম ও সমাজ বলতে যা কিছু আছে, সে সকলেরই বীজ প্রথমে চারা হয়ে ওঠে এই পুণ্যময় এসিয়া ভূমিখণ্ডেই। বিজ্ঞান, দর্শন, কলাবিদ্যা, চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতিষ ইত্যাদি মানুষের দেহের, মনের এবং সমাজের উন্নতির যত পন্থাই আছে সে সকলেরই প্রথমে পথপ্রদর্শক ছিলেন যাঁহারা তাঁদের প্রায় সকলেই এসিয়াবাসী। ইঁহাদের কীর্ত্তির কথা তো জগতের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা আছে, তার মধ্যে নৈরাশ্যের, বিফলতার কোনও গন্ধ তো আমরা পাই না, তবে কেন এসিয়াবাসী নৈরাশ্যের মন্ত্রণা নিয়ে চলবে ?

যাঁরা মানুষকে বাঁচানর চেয়ে মানুষকে মারাই বড় কাজ মনে করেন, যাঁরা দেশকে গড়ার চেয়ে

দেশ উজাড় করাই বেশী গৌরবের কথা ভাবেন, তাঁরা বলবেন, ইতিহাসে বড় বড় বিজেতা, বিশাল সাম্রাজ্য সংস্থাপক, যথা আলেকজাণ্ডার, জুলিয়স সীজার, নেপোলিয়ন ইত্যাদি সবাই এসিয়ার বাইরে জন্মেছিলেন। কিন্তু এখানেও তাঁদের ভুল, কেননা ইতিহাসের সকলের চাইতে বড় বিজেতা ছিলেন এক উত্তর এসিয়াবাসী, যাঁহার নাম চংঘিজ খান্ বলিয়া বিদেশী ইতিহাসে লিখিত আছে। দেশ-জয়ের কথা ছেড়ে দিয়ে দেশ গড়া, মানব জাতির উন্নতি, সভ্যতার সৃষ্টির কথা ইত্যাদি ভেবে দেখলে দেখা যায় যে, মানুষ যা-কিছু নিয়ে বড় হয়েছে, তার বেশীর ভাগই এই এসিয়ার গড়া মাল-মসল্লা দিয়া তৈরী। তবে কেন আমরা হতাশ হয়ে বসে জীবনের দিন গুণে কপাল চাপড়ে কাটাবো?

এসব কথা বল্‌লে আধুনিক এক দল আছেন তাঁরা বলবেন 'ওসব অতীতের কথা, কত শত বৎসর আগে কি হয়েছে তা ভেবে কি লাভ?' এঁদের মতে আমাদের আর নিজস্ব কোনও পুঁজী নাই, এখন একমাত্র উপায় নিজের যা কিছু আছে সব বিসর্জ্জন দিয়ে বিদেশীর কাছ থেকে সব কিছু ধার করে এদেশটাকে নকল-বিদেশ করা! আবার সেখানেও বিপদ আদর্শ নিয়ে; কেউ বলেন সব কিছু করতে হবে রুশ-সোভিয়েটের নমুনায়, কেউ বলেন, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের নমুনায়—জার্ম্মানী, জাপানের নামগুলো আইন-কানুনে আটকে কতকটা গণ্ডগোল গিয়েছে—এই রকম নানা পণ্ডিতের নানা মত। নিজের দেশের কি ছিল, কি আছে এবং যা আছে তাই দিয়ে কি গড়া যায়, সে-কথা ভাবে অল্প লোকেই। দেশকে নূতন করে সজীব, সরস, তাজা ও মজবুত করে গড়ে তুলতে হলে সব কিছুই যদি বিদেশী আমদানী করা হয়, তবে তার ফলটা কি রকম অদ্ভুত হবে, সে কথা ভাবা দরকার। অবশ্য একথা ঠিক যে, বিদেশী অনেক কিছুই এদেশে আনা দরকার—তার কিছু এসেছে, আরও কিছু আসবে—কেননা পৃথিবীতে যখনই যে জাতি নিজের উন্নতি করেছে সে তখন অন্যান্য জাতির মধ্যে যেটা ভাল, যেটা উন্নতির উপায় সেটাকে নিজের মধ্যে এনে নিজের করে নিয়েছে। আমরাও তো সে রকম করতে পারি, তাতে তো নিজের সবকিছু বিসর্জ্জন দিয়ে বসতে হয় না। যাঁরা বলেন সেটা সম্ভব নয়, এদেশ এতো পেছিয়ে গেছে যে ওপথে কিছুই হবে না, তাঁদের একটা দৃষ্টান্তের কথা ভেবে দেখতে বলি, এই এসিয়া ভূমিখণ্ডেই অল্পদিনের মধ্যে যা ঘটেছে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

অভিজ্ঞপ্ত মূর্ত্তি

(রহস্যমূলক বড়ো গল্প)

বেগম জেবু আহমদ

২২শে জুলাই। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। মেঘের স্তূপ গলে গলে ঝরছে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি। শিরশিরে শিহরণ জাগিয়ে থেকে থেকে ঝড়ো-হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

আজো বসে আছি সেই ছোট হোটেলে। যেখানে বসেছিলাম সুদীর্ঘ তিনটি বছর পূর্ব্বে। সেদিন আকাশ মেঘের কালো পর্দায় ছিলো ঢাকা আজকেরই মতো। সেদিনও পড়ছিলো ঝরে ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি অজস্র ধারায়। অবশ্য সেদিন ছিলো আমার একমাত্র বন্ধু, আমার পাশটিতে। আজ আমি একা। বন্ধু নেই পাশে—নেই কোথাও।

শোচনীয়ভাবে তার মৃত্যু হয়েছিলো এখানেই। ১৯৩৮ ইংরেজীর ২২শে জুলাই; এই বারান্দায়—ধুবরীর ছোট হোটেলের এই ছোট বারান্দায় বসেছিলাম আমি ও অমল। এখানেই এসেছিলো মৃত্যুর বার্ত্তা বহন করে সেই অজানা ভদ্রলোক।

যার অন্তে হারাতে হয়েছে আমার প্রিয় বন্ধুকে। অজানা ভদ্রলোক আমার বন্ধুর মৃত্যুর অন্তে দায়ী? হয়তো নয়। হয়তো একমাত্র অভিশপ্ত মূর্ত্তিই তার অন্তে দায়ী। আমারি চোখের সামনে মাত্র দিন পনেরোর ব্যবধানে দু-দুটো খুন হলো। প্রথমে সেই অজানা ভদ্রলোকটি ধুবরীর স্টেশনে, তারপর অমল ব্রহ্মপুত্রের তীরে। উঃ, কী ভয়াবহ করুণ সে দৃশ্য! আজো আমি ভুলতে পারি নে। এখানে, এই ধুবরী-সহরে অমল প্রাণ হারিয়েছে।

প্রত্যেক গরমের ছুটিতে আর কোথাও যাইনে, যেতে পারিনে। কী দুর্ব্বার আকর্ষণ আমাকে টেনে নিয়ে আসে এখানে, বলবে কে?

অমলের মৃত্যুর পরও ধুবরীতেই আসি প্রত্যেক গরমের ছুটিতে। এই ছোট হোটেলে বাসা নি। যে কামরায় আমি ও অমল ছিলাম, সেখানেই কাটিয়ে দিই ছুটির কটা দিন। নির্জ্জন বারান্দায় বসে থাকি দূর দিগন্তের পানে তাকিয়ে। বর্ষণ-মুখর আকাশ, থমথমে পৃথিবী জুড়ে শোকের করুণ কাকলি বেড়ায় ঘুরে। কালো অন্ধকার যখন লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে আসে, মনে হয় এখনি আসবে অমল। আমার বন্ধু অমল, যাকে আমি হারিয়েছি সুদীর্ঘ তিনটী বছর পূর্ব্বে। অজানা আগন্তুক পা টিপে টিপে যদি হঠাৎ আসে যেমন করে এসেছিলো সেই বিভীষিকাময় রাত্রে। যদি এসে পড়ে, এসে পড়ে হঠাৎ আমার বন্ধুকে ছিনিয়ে নিতে। শিউরে উঠে দেখি, কোথাও নেই কেউ। বসে আছি আমি একা। একা বসে আছি আমি সেই নির্জ্জন বারান্দায়। কেন বসে আছি জানি নে। আমার স্মৃতির পর্দ্দায় ভেসে উঠছে—১৯৩৮ ইংরেজীর সেই করুণ মর্ম্মান্তিক কাহিনী। বাইরে আকাশ কাঁদছে, আমার অন্তরও কী সেই সঙ্গে হাহাকারে ফেটে পড়ছে না। তবু কেন আসি এখানে। কেন এসেছি, বসেছি এই বারান্দায়। কে বলবে?

অমল ছিলো আমার বাল্যবন্ধু। স্কুলে পড়া-শোনার পর কলেজ-জীবন, তারপর সব সময়েতে আমাদের বন্ধুত্বের বাঁধন দৃঢ় ছিলো। মাঝখানে উভয়েই কার্য্যোপলক্ষে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। তবু বৎসরের মধ্যে আমরা পরস্পরকে না দেখে কিছুতেই থাকতে পারতাম না। প্রত্যেক বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা ধুবরীর হোটেলে এসে বাসা নিয়ে সহজ আনন্দের ভেতর ছুটি উপভোগ করতাম। দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে কেন যে আমরা আসামের একটি ছোট সহরে এসে তার প্রচুর বৈচিত্র্য উপভোগ করে অনেক আনন্দ পেতাম, তা জানিনে। আমি ও অমল এই ছোট হোটেলের দক্ষিণমুখো কামরা আর সামনের পুরানো বারান্দার মায়ায় পড়ে গেছলাম যেন। এদিকটায় কেউ বড়ো আসতো না। কোলাহল যেন তেমন এসে পৌঁছতো না। কাযেই আমাদের নির্জ্জনতাপ্রিয় মন পরম শান্তিতে ছিলো। আমাদের কাব্য বা সাহিত্য-চর্চ্চায়ও কোন বিঘ্ন ঘটেনি। সাহিত্যের প্রতি আমাদের ছিলো প্রবল অনুরাগ। অমল ছিলো আবার সাংবাদিক। স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলো সে সাংবাদিকের জীবন। বৈচিত্র্যের প্রতি দুর্ব্বার আকর্ষণ আর অসীম কাব্য-তৃষ্ণা তাকে চালিয়ে নিয়েছিলো হয়তো এই নতুন পথে। আর এই বৈচিত্র্যই হলো তার শোচনীয় মৃত্যুর একমাত্র কারণ।

হোটেলের ম্যানেজার আমাদের এমন স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাই আমরা প্রত্যেক বছরই এই কামরাতে বাস করতে কোনো অসু-বিধে বোধ করিনি। আমাদের জন্যেই এ সময়-টায় অন্তত দক্ষিণমুখো এই কামরা যেন রিজার্ভ থাকতো।

১৯৩৮ সালের সন্ধ্যা। আমি ও অমল বসে-ছিলাম এখানে, এই বারান্দায়। আকাশ ছিলো অমনি কালো মেঘে ঢাকা। সারাদিন ঝরেছে জল ঝুপঝুপ করে। হয়তো বন্ধ হয়েছে কখনো বৃষ্টি পড়া, কিন্তু সূর্য্যের প্রসন্ন হাসির ঝিলিক আর ফোটেনি। থমথমে আকাশ আর ধূসর পৃথিবী জুড়ে নেমে এসেছে অজানা আতঙ্ক, বিভীষিকার কালো করাল-ছায়া। মনে হচ্ছিলো জল ঝরুক, বাদলের ঝরঝরানি-গান একটানা বেজেরা হলেও এর চেয়ে ভালো। মেঘের কালো ছায়াকে আরো ভয়াবহ করে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো। গাছপালার সঙ্গে ঝড়ো-হাওয়ার দাপা-দাপি, থেকে-থেকে হু-হু করে বয়ে যাওয়া ঝড়ের রাত্রিকে যেন আরো ভয়ঙ্কর করে তুলেছিলো।

এমন দুর্য্যোগের রাত্রেও আমরা বারান্দায় বসেছিলাম। ঘরে না বসে, আমাদের খেয়ালী স্বভাবকে যেন অপান্ত প্রকৃতির সাথে মিতালি পাতিয়ে নিয়ে হাল্কা সুযোগ-কোনো দিয়েছিলাম। হোটেলের দরজা-জানালা সন্ধ্যার পর থেকে বন্ধ। পথ নির্জ্জন, এমন দুর্য্যোগে কেউ রাস্তায় নেই, কেমন নিস্তব্ধভাব সব দিকে। হঠাৎ রাজপথ সচকিত করে একখানা মোটরকার এসে থামলো হোটেলের দরজায়। কার মোটর, কে এলো, আমরা খোঁজ নেয়া প্রয়োজন বোধ করিনি। কতো লোকই তো আসছে হোটেলে। আজ দুর্য্যোগের রাত্রে কাউকে আসতে হলে মোটরেই তো আসতে হবে। তাতে আর বিচিত্র কি। ম্যানেজারের অফিসখানা ছিলো আমাদের বারান্দার উল্টো দিকে। আমাদের অতিক্রম না করে ম্যানে-জারের অফিস-ঘরে কারুর যাবার উপায় ছিলো না। গল্পে আমরা এতো মসগুল হয়ে পড়েছিলাম যে, লোকজন যাতায়াত করছে কি না সেদিকে লক্ষ্য ছিলো না।...রাত প্রায় আটটা। আমরা উঠতে যাবো, হঠাৎ দেখি একজন অজানা লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। কাছে এসে তিনি 'গুডনাইট' জানিয়ে আমাদের অনুরোধের অপেক্ষা না করেই একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। আমরা যে দৃষ্টিতে চাইলাম আগন্তুকের প্রতি, তা কৌতূহল ও বিরক্তিপূর্ণ। আগন্তুকের ভাবভঙ্গি দেখে কেমন যেন অস্বস্তিবোধ হচ্ছিলো।

দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো তিনি পাঞ্জাবের অধিবাসী। সুদীর্ঘ দেহ কঠোর সহিষ্ণুতার সাক্ষ্য দিচ্ছিলো। উজ্জ্বল দুটো চোখ। সৌম্য মুখ-মণ্ডলে অসীম সাহসিকতা ও ধৈর্য্যের ছাপ ছিলো স্পষ্টতরো।

আমরা কিছু বলবার পূর্ব্বেই আগন্তুক বললেন: আপনারা দু-জন বন্ধু। লেখক বা সাহিত্যিক, একাকী থাকতে পছন্দ করেন বেশি।

আমরা চোখে অবাক লাগিয়ে চেয়ে আছি দেখে আগন্তুক আমাদের মনোভাব বুঝতে পেরে আবার বললেন : আশ্চর্য্য হবেন না। এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। আমি আপনাদের ভাব-ভঙ্গি আর কথাবার্ত্তায় কিছু বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেও কেন আপনাদের বিরক্ত করতে এসেছি অবিশ্যি সে প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন। ভদ্রলোক একটু থেমে অযাচিতভাবে বললেন: আমি একটি গল্প বলতে চাই। আপনারা বেশ কৌতূহলের সঙ্গে গল্পটি উপভোগ করবেন, আশা করি। পৃথিবীর এতো লোক থাকতে, এতো জায়গা থাকতে ধুবরীর ছোট হোটেলে এসে আপনাদের কাছে গল্প বলার কারণ জিজ্ঞেস করলে কোনো জবাব পাবেন না, কেন না আমি নিজেই তার কিছু জানি নে। আমার মন বলে দিয়েছে, আপনাদের দেখা মাত্রই মন যেন বলে দিলো, এঁরাই সেই মানুষ, যাঁদের এতোকাল ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছো।

কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলাম। আমি মুখ তুলে ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করছিলাম, তাঁর কথাও

মন দিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে শুনছিলাম। তাঁর কথা শেষ হতেই চোখ ফিরিয়ে তাকালাম অমলের দিকে। পরক্ষণেই এ কি! অমলের চেহারা অমন পরি-বর্ত্তিত হলো কেমন করে। উজ্জ্বল চোখ দুটো তার অলঅল করে উঠেছে। শরীরে দেখা দিয়েছে এক ধরণের তন্ময়তা। নিবিষ্ট মনে সেও শুনচে গল্প। ভয় পেলাম, আগন্তুকের আচরণ আমার আদপেই ভালো লাগেনি। অমলকে সতর্ক করে দিতে চাইলাম। কিন্তু কোন কথা বলবার অবকাশ পেলাম না। অমল পরম উৎসুক হয়ে শুনে যেতে লাগলো আগন্তুকের কাহিনী।

'লাহোরের একটি ছোটো পল্লী-অঞ্চলে ছিলো আমার বাড়ী। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে দেশ-বিদেশে ঘুরেই কিন্তু কাটতো আমার দিন। ব্যবসায় যাতে উন্নতি হয় তাই ছিলো আমার একান্ত কামনা। সাধারণ ঘরে ব্যবসার ভেতর দিয়ে আমি কোটিপতি হতে চেয়েছিলাম। অধিকন্তু ব্যবসার মতোই উন্নতি হচ্ছিলো, আমার ধনস্পৃহা ততোই বেড়ে যাচ্ছিলো। কাজের চাপে একবার ইউরোপেও যেতে হয়েছিলো। ফেরার পথে মালয়ে উঠেছিলাম। মালয় সম্বন্ধে কৌতূহল ছিলো প্রচুর। মালয়ের সব-কিছু এই সুযোগে দেখে নেবার লোভ চেপে রাখতে পারিনি। মালয়ের অধিবাসী যদিও অনেকটা সভ্য হয়েছে ইউরো-পীয় সভ্যতার ছোঁয়া পেয়ে তবু মালয়ের অভ্যন্তরে এখনো অনেক খাঁটির আদিম অধিবাসী রয়েছে। তারা খুবই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। বিদেশীদের ওরা প্রীতির চক্ষে দেখে না মোটেই। আমি এ সব জেনেও তাদের হাতে পড়েছিলাম। পড়েছিলাম আমারই প্রচণ্ড কৌতূহলের জন্যে। আমার গায়ে-পড়ে আলাপ করা, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কিছুই তারা সুনজরে দেখেনি। সন্দেহ করেছিলো প্রথম থেকেই। শুধু সন্দেহ করেই ক্ষান্ত ছিলো না, বিপদে ফেল-তেও চক্রান্ত করেছিলো। ফলে আমাকেও ওদের ফাঁদে আটক পড়তে দেরী হয়নি। (ক্রমশঃ)

চুম্বক-রহস্য

সরদার এম. এ. হামিদ বি-এ

আজকাল চুম্বক লোহার আর নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না, মানব সভ্যতার অতি প্রাচীন যুগ হইতে চুম্বকের সহিত মানুষ পরিচিত। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (যে শক্তির বলে পৃথিবী সকল পদার্থকে নিজের দিকে টানে) মত চুম্বকশক্তি বা ম্যাগনেটিক ফোর্স সমগ্র জগতে অলক্ষ্যে কাজ করিতেছে, এ কথা সকল জ্ঞানী লোকই স্বীকার করেন। বাস্তবিকই যতই বিজ্ঞানের প্রসার হইতেছে, ততই চুম্বকের ব্যবহার-প্রণালী বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে নাবিকগণ সমুদ্র-পথে দিক্-নির্ণয় করার জন্য চুম্বক-প্রস্তরকে লোডষ্টোন নাম দিয়া ব্যবহার করিতেন। তাহারই উন্নতির ফলে বর্ত্তমানে দিক্-নির্ণয়যন্ত্র বা কম্পাসের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই চুম্বকের সাহায্যে আমরা ডাইনামো (dynamo) বা জেনারেটর (generator) প্রস্তুত করিয়া প্রতি সহরে যান্ত্রিক উপায়ে বিদ্যুৎ-সরবরাহ করিতে পারিয়াছি। বৈদ্যুতিক পাখা, মোটর প্রভৃতি এই চুম্বকেরই মুখ চেয়ে থাকে। বর্ত্তমান শতাব্দীর আশ্চর্য্য, রেডিও-ওয়েভ বা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ এই চুম্বক ও বিদ্যুতের সমবেত চেষ্টার ফল। ইহা ছাড়া রেডিওর বহু অঙ্গ, যেমন—টাল্সফরমার, হেডফোন, লাউড-স্পীকার প্রভৃতি চুম্বকেরই খেলা। বস্তুতঃ, বিদ্যুৎ ও চুম্বক বর্ত্তমান বিজ্ঞান-জগতের প্রাণস্বরূপ। ইহাদের যে কোনটার অভাবে সভ্য-জগত একে-বারে অচল হইয়া পড়িবে।

প্রায় একশত পঁচিশ বৎসর হইল বিদ্যুতের সহিত চুম্বকের কিরূপ বন্ধন তাহা প্রথমে আবিষ্কৃত

হইয়াছে। হান্স ক্রীশ্চিয়ান ওরষ্টেড নামে একজন ডেনমার্কের বৈজ্ঞানিক ১৮২০ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করিলেন যে, কোন তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ (কারেণ্ট) চলিতে থাকিলে তদ্দ্বারা চুম্বক-লৌহ নির্ম্মিত কাঁটা আকৃষ্ট হয়। তাহার এক বৎসর পরে ফ্যারাডে সাহেব এইরূপ পরীক্ষার ফলে একটা ঐরূপ কাঁটাকে ঘুরাইতে সক্ষম হন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ফ্যারাডে সাহেবই তাঁহার বিখ্যাত ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইনডাকশন আবিষ্কার করেন।

ফলফলের কীর্ত্তি

মোস্তফা কামাল

প্রথমে ছিলাম আমি একটি ক্ষুদ্র পিঁপ্‌ড়ে। আমার নাম ছিল চট্‌পটে সর্দ্দার। আমাদের পদবী ছিল সর্দ্দার। আমার বাবার নাম ছিল ভট্‌ভটে সর্দ্দার। গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভাল নাম ছিল আমাদের। আমার ভাই, সে ছিল এক নম্বর ফক্কর। তার নাম ছিল ফলফলে সর্দ্দার। ওর জন্যই আমার আজ এমন দুরবস্থা। ওই আমার বাবার বিরাট সম্পত্তি নষ্ট করেছে। গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ছিলাম আমরা, কিন্তু ফক্কর-দাদার জন্য আমরা হ'য়ে গেলাম দরিদ্র। যাক্, আসল ঘটনা এখন আরম্ভ করছি।

বাবা একদিন গেলেন খুব জোগাড় করতে, কেননা সেদিন বাড়ীতে রান্না করে খাবার একটা খুদও ছিল না। মা বসে ছিলেন। আমি গিয়েছিলাম কাঠ কাটতে। দাদা গিয়েছিল বদ্‌মাইসি করতে পাড়ার যত সব ফক্করদের কাছে। আমি কাটছিলাম কাঠ। একটা লোক আমার গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল। সে ছিল খোঁড়া। ভাগ্যে আমার খোঁড়ার অংশটা আমার গায়ে পড়েছে, নইলে অন্য অংশটা পড়্‌লে মরেই যেতাম। যাক্ বাঁচা গেল। তারপর গেলাম আগে। সাম্‌নে একটা ঢিপি ছিল। ওর উপরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম যে সে কে! ও বাবা, এর সঙ্গে যে ফক্কর-দাদার পরিচয় আছে। দাঁড়াও বাহাধন, আমার পক্ষে না আস্‌লে দেখিয়ে দেব মজাটা।

তারপর গিয়ে দু হাত তুলে বল্লাম, "নমস্কার, প্রসন্নবাবু—নমস্কার।" প্রসন্নবাবু বল্লেন "নমস্কার।" আমি বল্লাম, জানেন প্রসন্নবাবু, আমার দাদা আপনাকে মারবার পরামর্শ করেছেন? প্রসন্নবাবু রেগে বল্লেন, "বদমাইস্, তোর দাদাই তো আমার পক্ষে যে, তোকেই মারবার পরামর্শ কচ্ছি আমরা, আর সেকি না আমাকে মারবার পরামর্শ দেয় তোকে? ফলফলে কিছুতেই এ কথা বল্‌তে পারে না।" বলেই তিনি দাদার কাছে চলে গেলেন। আমিও নিলাম পিছু।

যেতে যেতে দেখ্‌লাম প্রসন্নবাবু দাদার কাছে এসে সব কথা বল্‌ছেন। আমি শুন্‌লাম। তারপর আস্তে আস্তে ফিরে এলাম বাড়ীতে। মাকে জানালাম সব কথা। বাবারও শুনতে বাকী রইল না। মা দুঃখে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। বাবা রাগে গর্‌গর্ করতে লাগ্‌লেন, বল্লেন—"আসুক আগে ফলফলে।"

কিছুক্ষণ পরে দাদা এসে উপস্থিত। বাবা তাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌লেন এই সম্বন্ধে। কতক প্রশ্নের জবাব দাদা দিতে পারলেন না। শেষে বাবা বল্লেন—আজ একটা খুদও পাই নাই, তার তো রাগ আছে; তা ছাড়া এই বদ্‌মাস্টার জ্বালায় পারা গেল না। এটাকে আমি কি করবো? মা তখন জিভে কামড় দিলেন, আমি তখন আকাশ থেকে পড়লাম। এর মানে হয়ত অনেকে বোঝে নাই। মানে হচ্ছে এই যে, আজ খাব কি? না খেতে পেয়ে যে মরবো। আমাদের বাসায় সত্যি সত্যিই চাল

ছিল কিন্তু ফক্কর-দাদার জন্যে থাকবে কেন? সব বিক্রী করেছে গাঁয়ের যত ফক্করদের কাছে। তখন ছিল এক পয়সা ক'রে খুদের সের কিন্তু সে বিক্রী করেছে আধ পয়সা সের দরে। আধ পয়সা লোকসান করে। আরো কত কী যে সে বেচেছে, তার কি ঠিক আছে? সেই জন্যই আমাদের এই সোণার সম্পত্তি ভেসে গেল। বাবা, মা গেলেন মারা। দাদা হ'ল সম্পত্তির মালিক। আমাকে দিল বাড়ী থেকে তাড়িয়ে। আমি অন্নাভাবে শুকিয়ে গেলাম।

আমাদের মধ্যে একটা মানত ছিল যে, জীবনে কুকুরের খাস্ত খাব না, কি ছোঁব না, কিন্তু পেটের জ্বালায় মরা কুকুর খেতে লাগলাম। দেবতা হলেন রাগান্বিত। পৃথিবী থেকে তুলে নিলেন আমাকে শাস্তি দেবার জন্যে। উঃ, সে কি কঠিন শাস্তি, সে কি কল্পনা করা যায়! সে কথা আমি কাউকে বল্‌বো না, বল্‌বো না—বল্‌বো না...।

পরে দেবতার রোষ হলো নিরাপিত। বললেন—যাও, কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ কর। নিমিষের মধ্যে কুকুর হয়ে গেলাম। কিন্তু এই কুকুর জাতির মধ্যেও শান্তি পেলাম না। ভাই, বোন, বাবা, মা প্রভৃতির বারণ, রাগ—এই সব দেখে ভাবলাম, কেন? কেন? কেন আমাকে জন্ম দিলে। কিন্তু এই হতভাগার ক্রন্দনরোল কি কারুর কাছে গিয়ে পৌঁছায়। কিন্তু এখনও আমি কুকুর বেশে অশান্তিতে বাস করছি।

মালি-ভাইয়ের চিঠি

বাংলার সাময়িকপত্রে ছোটদের আসর খুব বেশী নেই বললে আমাদের অন্যায় হবে না। তাই বাংলার শিশুরা যা'তে ভবিষ্যতে প্রকৃত মানুষ হ'তে পারে, জীবনকে গড়ে তুলতে পারে, সেই আশা নিয়ে আমাদের এই আসর। যাতে তাদের মধ্যে থাকে পবিত্রতা, সরলতা সেইজন্য এর নাম দিলাম: 'ফুলের মেলা'। আমাদের আশা, বাংলার প্রত্যেকটী কিশোর-কিশোরী ফুলের মতন ফুটবে, তার সৌরভ-গন্ধে আমরা দেশবাসীরা হব আনন্দিত। আর, তাদের সৌরভ-গন্ধের একটুখানি আলো তারা বিশ্বের দোর পর্য্যন্ত দেবে, একটুখানি হাসি তাদের মানুষের মনে অপার্থিব হিল্লোল জাগাবে, এই আমাদের আশা।

তোমাদের আসর যাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, সে-বিষয়ে আমরা সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকবো। খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাদের রচনা ত' থাকবেই সে-সঙ্গে তোমাদের নিজেদেরও সুন্দর-সুন্দর লেখা প্রকাশ পাবে।

প্রীতি নাও। তোমাদের: মালি-ভাই।

পরিচালক: 'ফুলের মেলা'—(গুলিস্তাঁ অফিস)
১২৭-এ বহুবাজার ষ্ট্রীট: কলিকাতা।

আমি তোমার আসরের সভ্য হতে চাই। আশা করি, তোমার 'ফুলের মেলা'য় আমার স্থান হবে। এতে আমার অভিভাবকদের আপত্তি নেই। আমার বয়স ১৮ বৎসরের নিচে। সঙ্গে এক বৎসরের প্রবেশ-মূল্য স্বরূপ তিন আনার ষ্ট্যাম্প দিলাম।

নাম.....
ঠিকানা.....
বয়েস.....

রূপক

নূরউদদীন মাহমুদ

তোমার মনে হয়, হয় তো আমি তোমাকে ভুলে গেছি। হয় তো তা মনে হতেও পারে, আমার কিন্তু তবুও বিশ্বেস হয় নি।

কেন হয় নি?

কী করে হবে? তুমি তো জানো, কী আবেষ্টনীর মধ্যে আমি রয়েছি, তুমি তো বুঝতে পারো হাজারো ইচ্ছে থাকিলেও শুধু, আমার নয়, তো তোমার তৃপ্তির দরুণও আমি কিছুই করতে পারি নে। কিছু-একটা করা সম্ভবও নয়।

অনেক দিন আগে পর্য্যন্ত অমন কথা শুনতে ভালো লাগতো। মনে হতো, ও-ছাড়া তো আর কোনো উপায়ও নেই। কিন্তু আজ আর—

কেন, আজ আর কি দোষ করলো?

তুমি জিজ্ঞেস করছো অমন কথা?

দোষের হয়েছে?

নয় কেন, কতো দূরের মানুষ কাছে এলো। কাছে আসার পরও কী সেই দূরের আকুতিই থাকবে এখনো তোমার ভাষণে! যখন ছিলে দূরে, তখন যা বলেছো, তা শুনেছি। বিশ্বেস করেছি, তুমি সত্য। কারণ, মিথ্যে তুমি বলবে কেন?

আজ মনে হচ্ছে, মিথ্যে বল্‌ছি আমি?

অনুযোগ করো না। কী হবে অভিমান করে? আমি তো জানি, তুমি কী। তুমি তো জানিয়েছো, তুমি কী। আমি জানি, তুমি ইচ্ছে করলে তোমার আবেষ্টনী থেকে বার হবার সদর রাস্তা তুমি সেলাই পাবে।

তুমি বিশ্বেস করো বুঝি অমন কথা?

করি।

তুমি বোকা, তাই. ঠিক অমন বিশ্বেস তুমি করতে পারো।

আমি বোকা, তাই। কী বলছো তুমি, রাবেয়া?

আশ্চর্য হবার কী পেলে আমার কথায়? সত্যি তাই বলেছি।

কী তোমার সত্যি?

মুসলমান-সমাজের মেয়ে আমি, মনে নেই তোমার?

তা ভুলবো কী করে?

তবে ভাবছো কী করে-যে আমি ইচ্ছে করলেই আসতে পারবো—ইচ্ছে করলেই প্রতিবন্ধক চূর্ণ করতে পারবো?

মনকে প্রবোধ দিচ্ছি, রাবেয়া। কারণ, ও-ছাড়া আর উপায় নেই।

প্রবোধ দিচ্ছো?

হ্যাঁ।

কেন, গো?

'কেন গো'! তোমরা এমন সুন্দর করে কথা কও, রাবেয়া, এতো সুন্দর তোমাদের কথা কওয়ার টোল—ভারি ভালো লাগে।

কী কথায় কী কথা আনছো তুমি।

প্রবোধ না দিয়ে উপায় কোথা-কিছু।

তুমি পুরুষ-মানুষ, তোমার মুখেও অমন কথা?

তুমি হাসাচ্ছো রাবেয়া, মুসলমান-সমাজের ছেলে-মেয়ের আলাদা কোনো সত্ত্বা আছে নাকি?

তোমাদের নেই?

না।

কিন্তু বরাবর তো শুনে আসছি, তোমাদের সব আছে।

মিথ্যে শুনেছো।

তোমরা হীরের টুকরো—সোণার ছেলে।

তোমার ও-ভুরুভংগি মাটি হয়ে গেলো, রাবেয়া। আজকের দিনে ওর কোনো মূল্য নেই। কোনো ছেলেই আজ সোণার দামে বিকোয় না।

তবু তোমরা তাই।

হয় তো তাই। হয় তো তোমার কথাই সত্যি। তাই জড়িয়ে-পাকিয়ে আমরা আজ গয়নায় সামিল। নড়ে-চড়ে বেড়ানোর কোনো উপায়ও হয় তো আর তাই নেই।

পাশ কাটাচ্ছো, বুঝতে পারছি।

কেমন?

একটু পরেই বলবে। জড়িয়ে-পাকিয়ে গেছি বলেই তো কোনো উপকারে এলাম না, তোমাকে কাছেও এনে উঠতে পারলাম না!

ঠিক ধরেছো। তুমি অদ্ভুত! আমি বলতামও তা। তুমি বলে ফেলেছো, তবু লজ্জা নেই। আমি এখনো বলছি তা।

কিন্তু কেন বলবে?

কেন নয়?

আমাকে তোমার পছন্দ হয় নি?

পছন্দ?

হ্যাঁ।

কেন জিজ্ঞেস করছো অমন প্রশ্ন?

দোষ কী?

তুমি পাগল! যে-দিন প্রথম তোমাকে আমি জানতে পেরেছিলাম—সে-দিন কোথা ছিলো এই পছন্দ-অপছন্দের কথা?

আমার দোষ হয়েছে, আবুল।

স্বীকারেও ফাড়া কাটে না। কেন জিজ্ঞেস করবে? তুমি তো জানো তোমার মধ্যে এমন-কিছু বিশেষ সামগ্রী রয়েছে, যার দুর্মূল্যতার পরিসীমা নেই।

দুর্মূল্যতা?

হ্যাঁ।

হাসাতে চাচ্ছো?

চুপ করো। আমি তোমাকে ভালোবাসি

এখনো ভালোবাসো?

কেন এমন করছো, রাবেয়া?

ভালোবাসি বলে।

ভালোবাসো বলে?

অবাক হয়ো না। ভালোবাসি বলে তোমাকে খেপাতে এতো ভালো লাগে। তোমাকে চটিয়ে তুলতে এতো আনন্দ পাই—এতো আনন্দ পাই।

আশ্চর্য তুমি!

মোটেই কিছু নই। তুমি সুন্দর, তাই অশেষ যত্নে—তোমার পরিচর্যায় আজকে আমি সুন্দর।

তুমি আশ্চর্য!

আজকে আমি আশ্চর্য। তবু, দুঃখের শেষ নেই।

দুঃখ?

তোমাকে না-দেখার দুঃখ।

না-দেখার দুঃখ?

না-পাওয়ার দুঃখ।

তুমি চেয়েছো আমাকে?

অবিশ্বাস করছো কেন? চাওয়াটা এমন-কিছু বড়ো নয়। আজো-যে আসতে পারলাম না, আসতে পারছি নে, তার দুঃখটা! তুমি ভাববে না তা?

জানি। কতো দুর্বোধ্য এই ব্যথা। কে জানতো ভালোবেসে এতো আনন্দ? কে জানতো ভালোবাসলাম, মানে, সমস্ত মন ভরে—শরীর ভরে একটানা যন্ত্রণার কশাঘাত নিরন্তর সহ্য করবার জন্যে নিজেকেই তৈরি করলাম!

তুমি এমন করে বলো কথা—

ভালো শোনায়?

পাগল করে দেয়।

কী মনে করো আমাকে ?

জানি নে। তুমি এতো সুন্দর !

তুমি জানো আমার গায়ের রঙ ময়লা।

তাই তুমি আরো সুন্দর। কতো সুন্দর তুমি চিন্তা করতে পারো, তাই কতো সুন্দর করে তুমি বলতে পারো।

আমার অবাক লাগে। অবাক লাগে এই বলে যে, যে-মেয়ে এতো ভালো করে আমাকে জানে, এতো ভালোবাসে, সে কেন তার দুর্বলতা সবায়ের সামনে মেলে ধরছে না।

কী বলছো তুমি ?

সবাইকে ডেকে কেন বলছো না, তুমি ভালোবাসো, তুমি ভালোবাসো আমাকে ?

তুমি পাগল হয়েছো ?

এখনো হই নি।

তুমি নিষ্ঠুর !

তবু ওটা আজ গুণ। আমার কিছুই তোমার কাছে গোপন নেই। তুমি জানো, আমার মতো পরনির্ভরশীল কেউ নেই। জেনেও নতুন-কিছু করলে কি ?

কেন আমাকে তুমি অনুরোধ করো ? কেন আমাকে তুমি অনুযোগ করবে ? তুমি পারো না, তুমি পারো না আমাকে নিয়ে যেতে ! তুমি তো পারতে এগিয়ে আসতে !

তা পারতাম।

কিন্তু তা তো তুমি করো নি !

করি নি-যে, সে-কথা কী আমি অস্বীকার করেছি, রাণী ?

কেন করো নি।

আমি তো ভাবতেই পারি নে, ছ-মিনিটের পথ ডিঙিয়ে একটা রেকর্ড তুমি রাখবে না কেন ?

ছ-মিনিটের পথ ?

নয় তো কী !

ডিনামাইট ছড়ানো অই ছ-মিনিটের পথ।

ডিনামাইট ?

সত্য কথা। এক পা এগোলেই যে-শব্দ, যে-বিস্ফোরণ, যে-অকথ্য চীৎকার উঠবে চারপাশে রি-রি করে : তুমি পারতে তার টাল সামলাতে ?

হয় তো পারতাম।

হয় তো ?

পারতাম, তুমি বিশ্বেস করো।

অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে থাকলেও পারছি কই ?

অবিশ্বাস তবু করো তুমি, রাবেয়া ?

করি। কারণ, তুমি পুরুষ-মানুষ, কতো শক্ত তোমার চিন্তা—কতো কঠিন তোমার শরীর। অমন চিন্তা আর শরীর নিয়েও তুমি যা পারো নি, পারলে না। আমি কী করে তা সম্পূর্ণ হতে না দেখেও হবে চঞ্চল বলো ?

তোমাকে দুষছি নে, আর দুষবোই-বা কেমন করে ? আমার ধারণা ছিলো, তুমি বুঝতে পারবে আমাকে। আমি নিরুপায় নই, অথর্ব নই, অশিক্ষিতও ঠিক নই,—তবু এমন রয়েছে দুর্ঘটনা, যা চূর্ণ করতে তোমারই সাহায্য-সাহচর্য দরকার সত্যি করে। মনে হয়েছে, তুমি এতোদিনেও তা বুঝতে পেরেছো। জীবনে হাত বাড়িয়েই সব পেয়েছি। কোনো চাওয়ার সামগ্রী তো ক্লেশে-যন্ত্রণায় ডুবে আমি চাই নি আজো। মনে হতো, আমার এই স্বভাব তুমি ধরতে পেরেছো। তাই শুধু বলেছি : এসো। সম্ভব হলে—সামান্য বাধা-কিছু সামনে থাকলে, তা সরিয়ে আসবে। আসাটাই হবে তোমার ধর্ম। আসার পর যা-কিছু তার সমস্ত ঝুঁকি থাকবে আমার ওপর। তোমাকে হাতের মুঠোয় পেলে, বিরুদ্ধ-পক্ষ দমিয়ে আনতে আমার উপস্থিতি সর্বত্র পাবে পুরোমাত্রায়—তথন তুমি থাকবে নেপথ্যে, আমার কুটিরে—আমার শয্যায় !

কেন বলো নি আগে এমন কথা ?

বলি নি ?

কখন বলেছো ?

এই কী বলার জিনিষ, রাবেয়া ? তোমার অন্তর নেই, আমার অভাবে তোমার কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে না ?

হচ্ছে গো, হচ্ছে। সর্বাংগ পুড়ে-পুড়ে যাচ্ছে।

সেই স্তরে আঘাত দিয়ে-দিয়ে জানতে চাও কী তারা চায়। সামান্য বিদ্রোহ, তারপর চির পরিতৃপ্তি, ন', সমগ্র জীবন ভরে তিল-তিল করে সহ্য করে যাবে অকথ্য শারীরিক-যন্ত্রণা। মানসিক অপমৃত্যু যে লেলিহান হয়ে তোমাকে বুড়িয়ে হিম করে ফেলতে চাচ্ছে—সে-দিকে কেন দৃষ্টি রাখছো না তুলে ?

আমি এমন করে বুঝি নি কিছু, আমি অমন করে কিছু চিন্তাও করি নি, আবুল।

দুর্ভাগ্য আমার।

কেন অমন করে বলছো, গো।

কেন বলবো না, পরের মেয়ে ! কতো দিন তুমি নিশ্চুপ বলো তো ? তোমার কোনো উদ্দিশ নেই।

আমি পারছি নে আর তোমার কাছে আসতে !

কী বলছো রাবেয়া ? তুমি ভালোবাসো না আমায় ?

বাসি গো, বাসি।

কেন বলছো, তবে অমন কথা ?

কেন বলছি ?

বলো কিছু।

জানিনে-যে কিছু !

রাবেয়া !

ডাকছো ?

রাবেয়া, কেন তুমি এতো অবুঝ হলে, রাণী ? কেন অমন উতলা হবে !

তুমি নেই কেন কাছে।

এই তো রয়েছি কাছে।

অমন করে নয়।

বুঝছি, কী চাচ্ছো তুমি। কিন্তু সে কী করে সম্ভব, যদি তুমি না আসো আমার এখানে ?

আমাকেই আসতে হবে ?

হবে। শুধু আসতে হবে।

শুধু আসতে হবে ?

শুধু এলেই হবে। শুধু তুমি আসবে। তারপর থাকবে একা আমার পাশে-পাশে। দু-জনের পদক্ষেপ ভারি হবে কতো। দু-জনে পথ চলতে পারবো কতো সহজে। তখন তোমার ইচ্ছে-আকাংখার শেষ রূপ—পরিপূর্ণ রূপ তুমি দেখতে পাবে।

তুমি দেখাবে ?

দেখাবো।

২

মানুষের মন বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি। এই মন মন্থন করিয়া কত-কত রূপোজ্জ্বল আনন্দ-ঝরোকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জীবনের সর্বকল্পনাসূত্র এই মন-সাম্রাজ্যে কতো সরসতার সংগেই না পুষ্টি পায়।

আদিঅন্তহীন অনৈতিহাসিক সময় হইতে আজো-পর্যন্ত মহার্ঘ কল্পনা—সুরম্য অন্তর-কামনা এই মানসলোক ঘিরিয়াই পরিপুষ্টি পাইয়া যুগের পর যুগ ধরিয়া সুসমৃদ্ধ হইয়াছে। স্খলন-বিচ্যুতি ইহার ভূষণ : অন্তর-কামনার উদ্বেলিত বীজসত্তার বিচ্যুতিরই পাশে-পাশে বিষম ঔজ্জ্বল্যে অনিন্দ্য। যেন স্খলনেই দয়িত-সুন্দর পরিতৃপ্তি পায়। মান-অভিমানের সংযোগ-সম্বন্ধে বিপুল আশা—বৈচিত্র্যময় কামনা নানা শাখা-প্রশাখা দিয়া বহির্গত হইয়া মানুষের অন্তর-আকাশে সোহাগে-কম্পনে অরুণোদয়ের শুভ্র বর্ষণের তাগিদে পরিস্ফুট হয়।

যুগান্ত হইতে এই কালজয়ী স্রোত প্রবাহিত। দুইটি অন্তর-রহস্যের পরি-সমাপ্তি আজো বিজ্ঞানের বিস্ময়োদ্রেক করিতেছে। ইহাদের কোন বাস-স্থান নাই, প্রকাশের কোনো বিশেষ মুহূর্ত কিংবা-কোনো আবির্ভাব-সংকেতও নাই। মন চিরিয়া-চিরিয়া কামনার জন্ম : ইহার বহিঃপ্রকাশ অশেষ সৌন্দর্যে-স্বাস্থ্যে মানুষের যুগ্ম-জীবন প্রেমে-মমতায় উদ্বেল করিয়া তুলে। তাই আজো মানুষ ইহারই উদ্দেশ্যে ঘুরিতেছে, ঘুরিয়া অবিমিশ্র স্বানন্দ উপলব্ধি করিতেছে।

শিক্ষা ও দেশের মেয়ে

কবি ও দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডু একবার বলেছিলেন : 'আমাদের দেশে মেয়েদের যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা সাধারণত: পুঁথিগত শিক্ষা। জীবনে যার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী।'—কথা কয়টি ভারী সত্যি। দেশে শিক্ষিতা মেয়ের অভাব রয়েছে, সে-কথা নিশ্চিত কেউ বলবেন না। সবাই জানেন, আজকে শিক্ষার স্রোত মেয়েদের মধ্যে অনেক প্রসারিত। এর ফলে, মেয়েরা শিক্ষা সত্যিই পাচ্ছে, কিন্তু শিক্ষিতা হচ্ছে কতোখানি? উচ্চ শিক্ষা পেয়েও মেয়েরা শিক্ষিত হয় নি, এ-কথাগুলো শোনায় মন্দ। কিন্তু ব্যাপারটা-যে ঘটেছেই তাই।

কেমন?—

—সংসারে, সমাজের, চিন্তার উজ্জ্বল পরিসরে যে-হেতু মেয়েদের আনাগোণা আজো মুষ্টিমেয়—যে-হেতু অপ্রশস্ত নবপ্রবর্তিত নোঙরা প্রাঙ্গনে তাদের পদক্ষেপ ক্ষিপ্রতরো।

সংঘাত একটা বেধেচে সত্যি, আবর্তের তরংগ একটা সোরগোল পাকিয়েচে। অবিশ্যি, যে-জিনিষ আলোচনার—সে হচ্ছে আমাদের মন। শিক্ষায় অতি-উষ্ণ আমাদের মন অনেকানেক যুগের অন্ধ-সংস্কারের সোহাগে মোহাচ্ছন্ন, এ-পলিমাটির স্তর। উপরটায় ঝাঁঝালো বৈদেশিক সূর্য-রশ্মি, তলায় হাজার বছরের জমানো ক্রীতদাসত্বের দাসত্ব-দলিল জলজল করচে।

কেন এই ব্যতিক্রম?

যেহেতু নিজেদের আমরা এখনো চিনে উঠতে পারি নি। কি আমরা? আমরা কি বিশ্বাস করি, জীবনকে আমরা জানি? জানি, একাকী দাঁড়াতে হলে কতোটা সহজ আর স্বচ্ছন্দ করতে হবে মনকে—চলাবার-ফেরবার আলোড়ন পর্য্যন্ত?—আর এই-ই আমাদের জীবনে অনুপস্থিত।

বস্তুত দেশের আলো-হাওয়াতেই আমরা বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি। তা না হলে, এমন কেন হবে? শিক্ষাই কেন জগদ্দলের মতো চেপে রইলো জীবনকে মনকে? যে-শিক্ষায় অন্তর নেই—সুবিপুল প্রাণোচ্ছ্বাস নেই, কে তার পেছনে মিথ্যে ঘুরে মরবে?

সমাজ-বিপ্লব ও নারী-প্রগতি

ইলা দত্তগুপ্তা

বর্তমান ভারতের আধুনিক মেয়েরা পাশ্চাত্যের রীতি-নীতি হৃদয়ংগম করে ফেলেছে অনেকখানি মিথ্যে নয়, এবং সে-কারণেই তারা অধিকতরো সর্বাংগসুন্দর সামাজিক আর আর্থিক স্বাধীনতার দাবী জনসমাজে উপস্থিত করেছে, আরো সর্বত্র লক্ষ্য করছি আজ। অত্যন্ত সাধারণভাবে পর্য-বেক্ষণ করলে মনে হওয়া আশ্চার্যের নয় যে,

মেয়েরা শুধু বুঝি প্রগতিপণা আর সে-সাথে প্রজাপতিপণায় দুর্বার বেগে ভেসে যাবার জন্যেই অমন সব দাবী দাওয়া উত্থাপন করেছে। অন্তত: আমাদের দেশের ছেলেরা উপরোক্ত কল্পনার আশ্রয় করতে পারলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আয়াশ জমাতে যে পারতো, তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু বুদ্ধিজীবী যাঁরা, তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য না করে বসে নেই নিশ্চুপ হয়ে যে, বাইরের স্বাধীনতার আর অধিকার সংপ্রসারণেই শুধু আজকে মেয়েরা তাদের শক্তি নিয়োগ করে নি, তাদের অন্তর-জগতেও আজকে বেশ একটা বড়ো রকমের বিপ্লব উপস্থিত হয়ে সোরগোল তুলেছে। বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, চিন্তার ঐশ্বর্যে গভীর উপলব্ধি-ক্ষমতার সব-কিছুতেই পরিপূর্ণ মেয়েরা নতুন দৃষ্টি-শক্তি আর যাচাইয়ে নিজেদের প্রকাশ করতে পক্ষপাতী।

অতীতে আমাদের দেশের মেয়েরা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় বাস করতো না, প্রাচীন পুঁথিপত্র এ-সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে। প্রত্যেকটি পুরুষের অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধে বদ্ধ থেকে তারই সহকর্মিণী হিসেবে পরিচিত হতো প্রত্যেকটি মেয়ে। পরস্পরের নিতান্ত সহজ প্রবৃত্তির পার্থক্য গভীর ঔদার্যের সংগেই ছেলেরা মেয়েদের, মেয়েরা ছেলেদের সম্মান করে চলতো।

মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই সমাজের আর রাষ্ট্রের নানানতরো পরিবর্তনে মেয়েরা এমন-একটা পরিস্থিতিতে এসে পড়েছিলো যাকে কোনো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ অস্বীকার করতে পারে নি। যুগান্তর ধরে যে-সমাজ-ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত, তাতে মেয়েদের দুটো আসনে সব-সময় আসীন থাকতে দেখা গেছে। প্রথম, জায়া: দ্বিতীয়, জননী।

সামাজিক ও আর্থিক ব্যাপারে ছেলেদের কাছে মেয়েদের দাসত্ব স্বীকার করতে হয়েছে, পরন্তু তাদের আর্থিক এবং নৈতিক-জীবনও যাতে করে সীমাবদ্ধ আর সংকুচিত হয়ে আসতে থাকে, সে-দিকে ছেলেদের দৃষ্টি কোনো কালেই অপ্রচুর ছিলো না। বিশেষ করে মেয়েদের অবিবাহিত-জীবন তো এক রকম সম্পূর্ণ করেই নিষিদ্ধ ছিলো।

একদিনে কিছুই হয় না, ক্রমাগত আন্দোলনেই আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা সুস্থ হয়ে আসছে (মহাত্মা গান্ধী)। আমরা দেখছিও, আজকের সমাজ-ব্যবস্থার সংগে দশ বৎসর আগের সমাজ-ব্যবস্থার তুলনাও করা চলে না। সমাজ ক্রমশ দ্রুতগতিতে ব্যক্তির সত্যিকারের দাবি আর অধিকার সন্তুষ্ট চিত্তেই মেনে নিচ্ছে। আজকে পরিবারের পরিবর্তে ব্যক্তিকেই সমাজের সমগ্র উপাদানরূপে স্বীকার করে নিয়ে নতুন, জীবন, দর্শনের অমোঘ বাণীর প্রচার করেছে।

বর্তমানে মেয়েরা, ছেলেদের আর মেয়েদের ওপর সমান ওজনে প্রযোজ্য নৈতিক বিধি-নিষেধের দাবি করছে। ছেলেদের জন্যে এক আর মেয়েদের জন্যে আর, এই দ্বৈত-নীতি যে, ছেলেদের সুবিধের জন্যেই পরিকল্পিত—সে-ধোঁকাবাজী অনেক দিনই মেয়েদের চোখে স্পষ্ট রূপ পেয়েছে।

যে-মেয়েরা স্বাধীনতা দাবি করে নির্মম বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে জনসমাজে স্পর্ধিত ভংগিতে চলে বেড়াচ্ছে, তারা যে শুধু শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কেই উৎকট ঘৃণা পোষণ করে আসছে তা-নয়, শাস্ত্রের সমস্ত রীতি-নীতি-পদ্ধতির কিছুই আর সে তার ব্যবহারিক-জীবনে গ্রহণ করবে না। সকলেই বুঝতে পেরেছে, স্বামী নয় তো বাবা-মায়ের কিংবা সমাজের বর্জন-নীতি শুধু মেয়েদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে তাদের দাবিয়ে কতকগুলো অশাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের নিগড়কে শাস্ত্রীয় বলে মানতে বাধ্য করা হতো।

মেয়েদের জীবন সমগ্রভাবে শুধু তারই নিজের, কৃতকার্যের দায়িত্বও তার, মেয়েদের ব্যক্তিত্বও ছেলেদের সমান এবং পবিত্র (টলষ্টয়)।

স্বাধীনতাই এই নতুন জীবনের মূলমন্ত্র। বর্তমানে বিয়ের ব্যাপারেই শুধু মেয়েদের অধিকার স্বীকার করলে চলবে না। আপনার ইচ্ছেমতো বিবাহিত-জীবন অথবা অবিবাহিত কুমারী-জীবন যাপনের স্বাধীনতার সুখ ভোগ করাও তার আর একটা মুখ্য-উদ্দেশ্য।

নতুন ভাবে জীবন-যাত্রা পদ্ধতি আংশিক গ্রহণ করলেও অনাচার না হয়েই পারে না। কিছুটা অনাচার ঘটেছে আমরা জানি, সে-সংগে এও আমরা জানি যে, এ না ঘটেই পারে না। সতীত্বই মেয়েদের একমাত্র ধর্ম আর কর্তব্যকার্য হতে পারে না, মেয়েদের জীবনে সরলতা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, প্রেম এ-গুলোরও তো প্রতিষ্ঠা হবে।

ছায়ার মায়া

পরিচালক দর্শক

দেশ ও ছায়া-ছবি

ফখরুল ইসলাম খান

ভারতীয় ছায়া-ছবির দর্শকসাধারণের মনে একটা জিজ্ঞাসা সব সময় আকুতি জানায়, যা হচ্ছে : আমাদের দেশের ছায়া-ছবিতে আমাদেরই জীবনের চিন্তার-আলাপের-চলনের স্ফূর্ত প্রকাশ নেই কেন! ব্যাপারটা ছায়া-ছবি জগতের ব্যবসায়ীদের চোখে আজো ধরা পড়েনি। পড়লেও-যে বিশেষ কিছু উপকার হবে, তাও মনে হয় না। তবে এ-টুকু নিশ্চিত আমরা বুঝতে পারছি যে, এই আবহাওয়া কোনো সময়ই কোনো দেশের ছায়া-ছবির পক্ষে শোভন নয় এবং তাতে ব্যবসায়-বুদ্ধিরই বরং সুস্থতার অভাব প্রকাশ করে দেয়। জনসাধারণের দাবির সঙ্গে পরিচয় না রেখে নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো কাষ করাতে কোনো বাহাদুরিই যে থাকতে পারে না, সে-চিন্তা আদৌ কারুর মগজে তাগড়া পেলো কী!

পরিবেশকদের পরিবেশনী-প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে চলচ্চিত্র-দর্শকেরা নতুন ছবির মুক্তিলাভের পূর্ব মুহূর্তে ভাবতে থাকে, সত্যিই এবারে এমন কিছু পর্দায় রূপায়িত হতে চলেছে, যা তাদের সত্যিকার তৃপ্তি দেয়ার, আনন্দ দেয়ার জন্যেই শুদ্ধমাত্র প্রযোজিত হয়েছে। মুক্তিলাভের পর ছবি দেখে এসে আবার প্রত্যেক প্রথমশ্রেণী দর্শকমাত্রেই বিমর্ষ হয়ে পড়ে। প্রধান কারণ, তারা যার স্বপ্ন দেখে এসেছে, যে অতিচেনা ব্যবহারিক-জীবনের স্বপ্ন-সৌধ তারা গড়েছে, এতদিন পরে তার অপমৃত্যুর দরুণ তারা পূর্বের মতোই স্তিমিত হয়ে পড়েছে।

মানুষের সাধারণ জীবনেই শুধু নয়, মনোজগতে-ভাবজগতেও চলচ্চিত্রের ছায়া গভীর করেই রেখাপাত করে থাকে। মানুষের জীবনে এই সরেস শিল্প-কলাটি বাস্তবিক পরম রমণীয় প্রলেপ লাগিয়ে যেতে নিরঙ্কুশ অবসর পায়। ঠিক এ-দিকটা থেকে আমরা কি মারাত্মকভাবেই না বঞ্চিত হয়ে রয়েছি!

ভারতীয় ছায়া-ছবির বয়েস নিতান্ত অল্প নয়। তবু দুঃখের বিষয় যে, দিনের পর দিন ধরে আমরা শুধু মিথ্যেরই পূজো করে এসেছি, মিথ্যের পেছনেই মিথ্যে ঘুরে-ঘুরে সময়-অর্থ-চিন্তা ব্যয় করে এসেছি।

সব থেকে দুঃখের কথা হচ্ছে যে, ভারতীয় জীবন-যাত্রাকেই যে ভারতীয় ছায়া-ছবি অবহেলা করে আসছে, তা নয়। ভারতের কোনো উচ্চাশা বা অগ্রগতির সঙ্গে তার কোনো সৌহার্দ্যও নেই।

দেশের শিল্প দেশের রস-গন্ধ-বায়ুতে পরিপুষ্ট নয়, দেশের স্বতঃস্ফূর্ত আকৃতিকে প্রকাশ না করে একটা অতি অবাস্তব নিরর্থক কর্ম-প্রচেষ্টায় যে-দেশের শিল্প জীবিত, তার সম্বন্ধে কি করে দেশের রস-পিপাসু দর্শকদের—জনসাধারণের থাকবে কৌতূহল—জানাবে অন্তরের শুভস্তুতি?

সোবিয়েতদের ছায়া-ছবি

এশিয়া ফিল্মস্ অব চায়না ভারতে সোবিয়েত-ভূমির ছবি প্রচার করে থাকে। মস্কো থেকে এম্ বল্‌সোকভ্ (ইনি সোবিয়েত্ অল-ইউনিয়ন ফিল্ম কমিটির চেয়ারম্যান) এশিয়া ফিল্মস্ অব চায়নার পরিচালককে তার করে ১৯৪৪ সালে